মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

বায়তুশ শরফ আঞ্জুমনে ইত্তেহাদ

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

প্রকাশকাল

চৈত্র ১৪১৬ বাংলা
রবিউস সানী ১৪৩১ হিজরী
মার্চ ২০১০ ইংরেজী

প্রকাশনায়

বায়তুশ শরফ আঞ্জুমনে ইত্তেহাদ
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০

পরিবেশক

- **বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী**
  মসজিদ বায়তুশ শরফ
  ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০
- **বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী**
  মসজিদ বায়তুশ শরফ
  ১৪৯/এ এয়ারপোর্ট রোড
  ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

মুদ্রণে

মাল্টিলিংক
৬৮ ফকিরাপুল, ইসলাম ভবন
ঢাকা-১০০০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

www.pathagar.com

লেখকের আরয

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর প্রশ্নে জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার চারটি প্রবন্ধ নিয়ে এই ছোট্ট পুস্তক 'মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত'। ২০০৯ সালের শুরুতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর উর্ধ্বতন মহল থেকে যখন বারবার বলা হচ্ছিল, ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হবে, তখন বন্ধু মহলের পরামর্শে একটি লেখা তৈরি করি। 'ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট : মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত' শিরোনামের সে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক ইনকিলাবের আদিগন্ত পাতায়। সরকারী মহল থেকে পুণরায় যখন একমুখি শিক্ষা চালু করার ঘোষণা দেয়া হয়, তখন 'ধর্মভিত্তিক কর্মমুখী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চাই' শীর্ষক আরেকটি লেখা পাঠিয়েছিলাম পত্রিকায়। লেখাটি দৈনিক ইনকিলাবের উপ-সম্পাদকীয় কলামে বেশ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। পরবর্তীতে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০৯' সরকারীভাবে ওয়েব সাইটে দেয়ার পর বুঝা গেল, আমার এতদিনকার আশংকাগুলোই সত্যি হতে যাচ্ছে। তখন একান্ত ঈমানী দায়িত্ব মনে করে দু'টি প্রবন্ধ লিখি। শিরোনাম: 'মাধ্যমিকের ইসলামিয়াত বিলুপ্তির পরিনাম' ও 'আরো সংস্কার বনাম মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব'। লেখা দু'টি দৈনিক নয়া দিগন্তের উপ-সম্পাদকীয় পাতায় ছাপানো হয় যথাক্রমে ২৪/১১/০৯ ও ১২/০৩/২০১০ তারিখে। লেখাগুলো প্রকাশের পর পাঠক মহলের পক্ষ হতে যত ফোন,দোয়া, ভালবাসা, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তা অন্তত আমার জীবনে অভূতপূর্ব ও অভাবনীয়। মনে হয়েছে, তাঁদের প্রাণের কথাগুলো আমি ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি-আলহামদু লিল্লাহ্। তাঁদের এই অনুপ্রেরণায় এবং নিজের সাধ্যের আওতায় কুরআন ও হাদীসের ইলম চর্চায় কিছুটা হলেও খেদমতের উদ্দেশ্যে লেখাগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশের এই ঝুঁকি নিয়েছি।

বইটির নামকরণে 'মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত' শব্দ তিনটি মনকে স্মৃতিকাতর করে ফেলেছে। এই আবেগঘন মুহূর্তে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার প্রাক্তন হেড মওলানা ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারামের সাবেক খতীব মরহুম মওলানা উবায়দুল হক ছাহেবের কথা। 'মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত' শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ৩ জুলাই দৈনিক আজাদের উপ-সম্পাদকীয় কলামে। তখন আমি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা

www.pathagar.com

ছাত্রাবাসের নিবাসী। পরদিন রাতের বেলা হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠানো হলো মাদ্রাসা-ই- আলিয়ার প্রবীণ ওস্তাদ মওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী ছাহেবের (র.) রুমে। আলিয়া হোষ্টেলের ২য় তলার মসজিদের দক্ষিণ পাশে তিনি সাময়িকভাবে থাকতেন । গিয়ে দেখি, সেখানে চেয়ারে বসে আছেন মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার হেড মওলানা মরহুম মওলানা উবায়দুল হক ছাহেব। তিনি এসেছেন আজিমপুর থেকে। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং চলায় বলায় বিশেষ গাম্ভীর্যের সাথে আগেই কিছুটা পরিচিত ছিলাম। তাই নবাগত ছাত্র হিসাবে ব্যাপারটি আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল । পরিচয় পর্ব শেষ করে তিনি অকপটে বললেন: 'আমি আজাদে লেখাটা পড়ে আপনার খোঁজে এসেছি, লেখাটা খুব ভাল হয়েছে, গঠনমূলক। কাল মাদ্রাসায় আমার সাথে দেখা করবেন।' আলিয়া হোস্টেলের সে রাতটি কত আনন্দ ও স্বপ্নের মধ্যে কেটেছিল তা গ্রাম হতে আসা রাজধানীর যে কোনো নবাগত ছাত্র ও অখ্যাত লেখক সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পরদিন হেড মওলানা হুজুরের দফতরে হাজির হলে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন পেছনের খাস কামরায়। একটি ফাইল কভার খুলে দেখিয়ে বললেন- এই দেখুন! আপনার লেখাটি পত্রিকা হতে কেটে ফাইলের গায়ে গাম দিয়ে লাগিয়ে রেখেছি। 'এই নিন আপনার উপহার' বলে একটি বই তুলে দিলেন হাতে। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার প্রাক্তন শিক্ষক মওলানা অব্দুস সাত্তার সাহেবের লেখা 'তারীখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া' (মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস)। বইটি অধ্যয়নে অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়ে গেলাম। শুরু হলো দৈনিক আজাদসহ জাতীয় পত্রপত্রিকায় লেখালেখি। প্রতিটি লেখাই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। পরবর্তী সাক্ষাতে সংশোধনী দেন, নতুন নতুন বিষয় নির্দেশ করেন। কিছুদিন পর ডেকে বললেন: এ পর্যন্ত প্রকাশিত লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নিন। আর্থিক দৈন্যতার কথা জানালে তিনি নিজ থেকে ১০০ আর উপস্থিত কয়েকজন সহকর্মী শিক্ষকের কাছ থেকে নিয়ে ৫০০ টাকার প্রাথমিক তহবিল গঠন করে দিলেন। ফোনে কথা বলার পর বললেন! বাংলা বাজারে মওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেবের সাথে দেখা করবেন। তিনি বইটি ছাপানোর ব্যবস্থা করবেন। দৈনিক আজাদের সূত্রে মাসিক মদীনা সম্পাদক মওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব আমার লেখালেখি সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন। তিনি তাঁর প্রেসের ব্যস্ততার কথা জানিয়ে বইয়ের পুরো কাগজ বাবৎ পকেট থেকে তখনকার দিনে ৯০০ টাকা বের করে দিলেন আর অন্যত্র বইটি ছাপানোর অনুরোধ করলেন।তাঁর উদারতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বইটি প্রকাশের পরের সপ্তাহে ঢাকায় মরহুম মওলানা আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বাধীনে জমিয়তুল মুদাররেসীন এর সম্মেলন ছিল। ফলে একদিনেই সম্পূর্ণ বই বিক্রি হয়ে সমগ্র দেশে চলে যাবার দুর্লভ সুযোগ হয়।

www.pathagar.com

এর পরের স্মৃতি আরো মধুর। বন্ধু মহল ছাড়াও মাদ্রাসার কত প্রবীণ ওস্তাদ ঢাকায় এসে বইটি লেখার জন্য আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ উজাড় করা দোয়া দিয়েছেন তার অন্ত নেই।বইটি হাতে পেয়ে প্রবীণ মুরব্বী মওলানা এ, কে, এম ইউসুফ সাহেব (সম্পাদক, আল-হুদা) দোয়া করলেন আর নগদ অর্থে ৫০টি বই কিনে নিয়ে বললেন: 'এগুলো আমি যেখানে সফরে যাই বিক্রি করব।' তবে আমার চিন্তার পরিগঠনে খতীব সাহেবের দোয়া ও দিক নির্দেশনার কথাই বারেবারে মনে পড়ছে। আমার প্রত্যেকটি লেখা তিনি মনযোগ সহকারে পড়তেন এবং পরবর্তী সাক্ষাতে নতুন পরামর্শ থাকলে নির্দেশ করতেন। ইনকিলাবের এক লেখায় দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সন ১৮৮০ সাল বলে উল্লেখ করেছিলাম, পরবর্তী এক অনুষ্ঠানে তিনি কানে কানে বলে দিলেন, সালটি হবে ১৮৬৬। একদিন মাদ্রাসা শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে কথা বলছিলাম তাঁর আজিমপুরস্থ বাসায়। বললেন: আপনার কথাগুলো প্রবন্ধ আকারে ইনকিলাবে ছাপতে দিন। বললাম,এই মর্মে একটি লেখা মওলানা রুহুল আমীন খানকে (দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক) দিয়েছি। কিন্তু তিনি ছাপান নি। বললেন: কেন? বললাম: আমি লেখা দেয়ার পর পুণরায় জিজ্ঞাসা করি না। মনে কিছু নিতে পারেন এই সংকোচে। বললেন: নতুন করে আরেকটি লেখায় কথাগুলো সাজিয়ে তার কাছে পৌঁছে দেন। মওলানা রহুল আমীন খান এবার ঠিকই লেখাটি যত্ন সহকারে উপ-সম্পাদকীয় কলামে ছাপিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ের লেখাগুলো নিয়ে প্রকাশিত 'মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বের দাবী' শিরোনামের বইটি হতে পেয়েও তিনি প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন।

'মাদ্রাসা শিক্ষা কোন পথে?' বইয়ের প্রকাশনায় অপর যে মুরব্বী প্রাণভরে দোয়া ও উদারভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের মরহুম পীর ছাহেব আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (র.)। তাঁর উত্তরসূরী বায়তুশ শরফের বর্তমান কান্ডারী শায়খুল হাদীস মওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন ছাহেবও (ম.জি.আ.)আমার এইলেখাগুলো পড়ে দোয়া করেছেন এবং বায়তুশ শরফের পক্ষ হতে প্রকাশের অনুমোদন দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁদের সবাইকে জযায়ে খাইর দান করুন।

ছোট্ট পুস্তকের ভূমিকায় এতটুকু স্মৃতিচারণ হতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এসব লেখা আমার হলেও কথা ও চিন্তা আমার একার নয়। এদেশে যাঁরা ধর্মীয় মুরব্বী ও মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের প্রাণভরা দোয়া ও রূহানী তাওয়াজ্জুহতে বলিয়ান এসব লেখা। লেখাগুলো শীর্ষস্থানীয় দু'টি জাতীয় দৈনিকে উপ-সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত হওয়ায় দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হওয়ার মানদন্ডেও উত্তীর্ণ। কাজেই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে চাই

www.pathagar.com

যে, আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা সমূহের দাখিল ও আলিম স্তরের সিলেবাস বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে তাতে আরো সংস্কার বা আধুনিকায়ন করা হলে এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে যেখানে স্কুল কলেজে পড়ে, সেখানে বৃটিশ আমল হতে চলে আসা এস এস সি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত তুলে দেয়া হলে জাতির ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অতি সহজে কিভাবে ইসলামী শিক্ষায় রূপান্তর করা যায় তার রূপরেখাও এঁকেছি ৩য় নিবন্ধটিতে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষার জন্য কতখানি প্রাণঘাতি হবে, সে সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছি শেষ নিবন্ধে।

এদেশের গরীব ধর্মপ্রাণ মানুষের রক্ত পানি করা শ্রম ও অর্থে গড়ে ওঠেছে হাজার হাজার মাদ্রাসা। বুযর্গ ওলামায়ে কেরাম সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন একেকটি মাদ্রাসার পেছনে। পীর মাশায়েখ দানশীল ব্যক্তিবর্গ লক্ষকোটি টাকা ব্যয় করেছেন এসব দীনি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে। তাই অগণিত ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকের আকুতি- কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্ ও আমল আখলাকের বাহন মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য-স্বাতন্ত্র্য যেন অক্ষুন্ন থাকে, উত্তরোত্তর আরো উন্নতি হয়। কিন্তু যখন দেখা যায়, উন্নয়নের শ্লোগানের আড়ালে মাদ্রাসা শিক্ষাকে শেষ করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তখন কার না প্রাণ কাঁদে।

শুরু থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে আমার লেখাগুলোও আসলে সেই কান্নাধ্বনি। এই কান্না যদি আপনার মনেও দাগ কাটে তাহলে দয়া করে একটু সাড়া দিন। বন্ধু মহলে, মাদ্রাসায়, মসজিদে, মাহফিলে, সেমিনারে, পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলুন, লিখুন।এর পরিণতি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কত ভয়াবহ হবে, একটু চিন্তা করে দেখুন। তাতে হয়ত একটি গণজাগরণ আসবে। ঈমানদারের বুকফাটা কান্নায় সেই গণজাগরণের সয়লাবে ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা ধংসের দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেসে যাবে।

ইয়া আল্লাহ্! তোমার দীনের এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অসংখ্য বুযর্গ ওস্তাদ, অগণিত আলেম জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সেই শিক্ষার খেদমতে তোমার এই নিঃস্ব বন্দার আঁকিবুকি লেখার এই ক্ষুদ্র নজরানা দয়া করে কবুল কর।

বিনয়াবনত-

০১৭১১১১৫৮২৯ মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
isashahedi@gmail.com

www.pathagar.com

আরো 'সংস্কার' বনাম মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব

আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষা (ইসলাম) দু'টি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বিত আলিয়া নেসাবভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ। আরেকটি ধারা সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন ধর্মীয় শিক্ষার কওমী মাদ্রাসা। আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে। আর কওমী মাদ্রাসার প্রবর্তন হয়েছে প্রায় ১০০ বছর পরে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসাকে ভিত্তি করে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তির ইতিহাস আরো পুরনো। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৮০০ বছরেরও আগে। তখন গোটা ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, চিকিৎসা, স্থাপত্য, রাষ্ট্রনীতি সব শিক্ষাই ছিল মাদ্রাসা ভিত্তিক। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অবিভক্ত বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন হয়। এর প্রায় ৫০ বছর পরে ১৮০১ সালে পোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা চালু হয়। এর আগে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা বা আজকের দিনের জেনারেল শিক্ষার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

আমরা যদি দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করি, তাহলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব যে, মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু ভারতবর্ষের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় শিক্ষাই ছিল না; বরং বাগদাদ কেন্দ্রিক ইসলামী জ্ঞানের যে ঐশ্বর্য মধ্যযুগের ইউরোপকে আলোকিত করেছে, তাও ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। রাসূলে পাকের (সা.) মক্কার জীবনে 'দারে আরকাম' ও মদীনার জীবনে 'মসজিদে নববী'কে কেন্দ্র করে এই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন হয়। এই শিক্ষাই কালক্রমে ইসলামের শৌর্যবীর্য ও মুসলমানদের দিগ্বিজয় ও গৌরব গাঁথার নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। আসলে আজ যে আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন মজিদ অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে আছে, রাসূলে পাক (সা.) এর অমৃত বাণী ও জীবনকথা হাদীস ও ইতিহাস এবং ইমামগণ ও মুসলিম মনীষীদের গবেষণার ফসল বিশাল ফিকাহশাস্ত্র ও অন্যান্য জ্ঞান ভান্ডার দুনিয়ার বুকে টিকে রয়েছে, তার বাহক ও পরিচর্যাকারীর ভূমিকা পালন করেছে মাদ্রাসা শিক্ষা। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষার এই গুরুত্ব ও ভূমিকাকে অস্বীকার বা অবহেলা করলে গোটা ইসলামকে অস্বীকার ও অবহেলা করা হবে।

দেড় হাজার বছরের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় যুগের জিজ্ঞাসা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস কখনো সম্প্রসারিত বা কখনো

www.pathagar.com

সংকোচিত হলেও আল্লাহর কালাম ও রাসূল (সা.) -এর হাদীসকে সরাসরি বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সব সময় মাদ্রাসা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে চলে আসছে। যেমন কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তাফসীর, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, হাদীস শরীফ ও ইসলামের ইতিহাস এবং ফিকাহশাস্ত্র ও মানতিক (যুক্তিশাস্ত্র), বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) আর এতদসংশিষ্ট দু'একটি বিষয়। ইংরেজ আমলের শেষভাগে জেনারেল শিক্ষা যখন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ নেয়, তখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে জেনারেল শিক্ষার সাথে সমন্বিত করার দাবি ওঠে। তখন সিলেটের আবু নসর ওয়াহিদের মতো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আলেমগণের প্রচেষ্টায় আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসাগুলোতে একটি স্বতন্ত্র ধারা চালু করা হয় নিউ স্কীম মাদ্রাসার নামে। এই ধারাটির সিলেবাস ছিল বর্তমান আলিয়া নেসাবের সিলেবাসের মতই। ফলে ১৯১৪-১৫ সাল থেকে নিউস্কীম ও ওল্ড স্কীম নামে আলিয়া নেসাবের দু'টি ধারা চলতে থাকে। কিন্তু কালক্রমে নিউস্কীম মাদ্রাসার ধারাটি সাধারণ স্কুল কলেজের রূপ ও চরিত্র ধারণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে সরকারীভাবে ঘোষণা দিয়ে অসংখ্য মাদ্রাসাকে স্কুল কলেজে পরিণত করা হয়। যার সংখ্যা ছিল ১৯৭৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ১০৭৪টি। ঢাকার বর্তমান নজরুল কলেজ, চট্টগ্রামের মহসিন কলেজ, রাজশাহীর হাই মাদ্রাসা এই ধরনের নিউ স্কীম মাদ্রাসাই ছিল। দ্বীনদার মুসলমান, ওলামায়ে কেরাম ও বুযর্গানে দ্বীনের অপরিসীম শ্রম সাধনায় প্রতিষ্ঠিত এতগুলো মাদ্রাসা স্কুল কলেজে পরিণত হওয়ার ইতিহাস যারা জানেন, তারা শুরু থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার যুগোপযোগী বা আধুনিকীকরণের নাম শুনলে আঁতকে ওঠেন এবং এটা স্বাভাবিক ও যৌক্তিকও বটে।

যারা মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার কথা বলেন তারা বর্তমান আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষা কতখানি যুগোপযোগী ও আধুনিক, তা জানেন না বা জানবার চেষ্টাও করেন না। এমন কি যারা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত এবং ইসলামী রাষ্ট্র, আদর্শ ও শিক্ষা নিয়ে কথা বলেন, দেখা গেছে তাদের অনেকেও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা জানেন না, কিংবা খোঁজ খবর না নিয়েই ঢালাও মন্তব্য করেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার ও যুগোপযোগী করতে হবে। এই সূত্রে কেউ কেউ বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ন কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে সুপারিশমালা পেশ করেছে তার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করণের জন্য হয়ত অনেক ভাল জিনিস আছে। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসটি সামনে রাখলেই তাদের এই সন্দেহ নিরসন হয়ে যাবে। প্রমাণ স্বরূপ আমরা মাত্র একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই, ২০১০ সালে যারা এস.এস.সি মানের দাখিল পরীক্ষা দিয়েছে তাদের

www.pathagar.com

সিলেবাস ও পরীক্ষার মান বন্টনের তালিকাটি সামনে রাখলে মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তর হতে ১০টি শিক্ষা বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা সহজ হবে। এবারের দাখিল পরীক্ষার্থীদের মোট নম্বর হচ্ছে ১১০০। তন্মধ্যে আরবী বা ধর্মীয় বিষয় ৫০০ আর সাধারণ বা জেনারেল সাবজেক্ট ৫০০ এবং অপশনাল ১০০ নম্বর। ধর্মীয় বিষয়গুলো হচ্ছে কুরআন মজীদ ১০০, হাদীস শরীফ ১০০, আরবী ১ম ও ২য় পত্র ২০০, ফিক্বহ ১০০। সাধারণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ইংরেজি ১০০, বাংলা ১০০, সমাজ বিজ্ঞান ১০০, গণিত ১০০ এবং ইসলামের ইতিহাস ১০০ আর ঐচ্ছিক ১০০ (কৃষি, কম্পিউটার, গার্হস্থ, মানতিক ইত্যাদি) এটি দাখিল সাধারণ বিষয়ের জন্যে। যারা দাখিল বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের জন্য সমাজ বিজ্ঞানের পরিবর্তে পদার্থ বিজ্ঞান ১০০, ইসলামের ইতিহাসের বদলে রসায়ন ১০০ এবং জীব বিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত, কৃষি প্রভৃতি হতে ঐচ্ছিক ১০০। এই ছক অনুযায়ী মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা পড়ানো হয় না বা কমতি আছে মর্মে কি কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে ?

এরপরও মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রবেশ ঠেকানোর উপায় হিসাবে শর্ত দিয়েছিলেন যে, ঐসব বিভাগে ভর্তি হবার জন্য শর্ত হচ্ছে এস. এস. সি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান বাংলা ও ইংরেজি ২০০ করে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক এ মতকে গ্রহণ না করলেও এবং মহামান্য আদালত এমন নিষেধাজ্ঞাকে বেআইনী ঘোষণা করলেও তারা মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি ঠেকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে অনড়। জ্ঞান চর্চার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে সর্বাধিক সম্মানের আসনে থেকে কত সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়া যায় উপরোক্ত জেদটি তার প্রমাণ। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত দায়িত্বশীলদের হীনমন্যতাও এখানে কম দায়ী নয়। প্রত্যেক বছর মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয় গড়ে দেড় লাখ আর আলিম পরীক্ষায় গড়ে পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী।তন্মধ্যে ক'জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখিত ৭ টি বিভাগে ভর্তির সুযোগ পায় ? ধরে নিলাম, বড়জোর ২০০ জন। অতীতের হিসাব নিলে মনে হয় না ৫/১০ জনের বেশী হবে। অথচ এই ৫/১০ কিংবা ২০০ জনের অনিশ্চিত ভাগ্যের আশায় একটি অন্যায় জেদের কাছে পরাভব মেনে দাখিলের দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রীর সিলেবাস-বিন্যাস তছনছ করা হচ্ছে। এভাবে মাদ্রাসায় দীনি শিক্ষার বারোটা বাজানোর বুদ্ধি কিভাবে মাথায় আসতে পারে, ভাবতেই অবাক লাগে।[১]

---

[১] আমার এ লেখাটি পত্রিকায় পড়ে শিরাজগঞ্জ হতে মোস্তফা মাহমুদ নামের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ফোনে বললেনঃ মাদ্রাসার এ ক'জন ছাত্রছাত্রী যদি একান্তই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ৭টি বিভাগে

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার অভিভাবকত্ব যারা করেন, তারা এভাবে পরাজয় বরণ করে সিলেবাস সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন। সে অনুযায়ী ২০১১ সালের দাখিল পরীক্ষার সিলেবাস নির্ধারণ করা হয়েছে ইংরেজি ২০০, বাংলা ২০০, আরবী ২০০, আর ইংরেজী বাংলার জন্য অতিরিক্ত নম্বর নেয়া হয়েছে আরবী ও ইসলামী বিষয়ের নম্বর সংকোচিত করেই।

এই হলো মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান সিলেবাসের অবস্থা। এখন জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য কি কি সুপারিশ করা হয়েছে এবং তাতে মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির যে আশংকা দেখা দিয়েছে তা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতে চাই।

শিক্ষানীতির ৬ষ্ঠ ধারায় মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যে সুন্দর কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.) এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে আচার সর্বস্ব নয় বরং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা। তারা এমনভাবে তৈরি হবে, যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বুঝে। সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়। (জা. শি. নী. পৃ- ২৭)

মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত এই ভাষ্যটি সত্যিই চমৎকার। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সিলেবাস দেয়া হয়েছে তা নিতান্তই নগন্য। এ সিলেবাস মাদ্রাসা ছাত্রদের যথাযথ ইসলামী জ্ঞানার্জনে শুধু যে সহায়ক হবে না তাই নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী জ্ঞানে পঙ্গু ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিলুপ্তি ডেকে আনার একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা।

তার পরের কথা হলো, বর্ণিত এই উদ্দেশ্য -লক্ষ্য মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না; বরং সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হতে পারে এটি। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে বুঝা ও জানা নয়; বরং কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আদর্শবান প্রচারক তৈরি

পড়তে আগ্রহী হয়, তারা দাখিল পাশ করার পর নতুন করে স্কুলে গিয়ে এস এস সি পাশ করে আসতে পারে। এমন কি অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পরিবর্তন করতে পারে। তা না করে দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য দাখিলের সিলেবাসে দীনি শিক্ষাকে শাসরুদ্ধ করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

www.pathagar.com

করাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কুরআন মজীদ এই লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে এইভাবে– "তাদের (মু'মিনদের) প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দল /অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং স্বজাতির মাঝে যখন ফিরে আসবে তখন যেন তাদেরকে সতর্ক করে। যাতে তারা সতর্ক হয়।" (সূরা তওবা, ১২২)

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রণেতারা যেমন মাদ্রাসা শিক্ষার এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম বা বুঝলেও তুলে ধরতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি দীর্ঘদিন মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষার সাথে জড়িত অনেকেও এ ক্ষেত্রে বিভ্রাটের সম্মুখীন হন। তারা বলেন যে, ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু মানব জীবনের সকল বিষয় ও দিক মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আবেগ প্রবণ হয়ে কেউ কেউ বলেন যে, ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার গর্ব ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, আল ফারাবী প্রমূখ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও মনীষী মাদ্রাসা শিক্ষা হতেই জন্ম নিয়েছেন। কাজেই বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাকেও সেইভাবে সাজাতে হবে। সম্ভবতঃ এ ধরনের প্রচারনায় প্রলুব্ধ হয়েই তারা মাদ্রাসায় বাণিজ্য বিভাগ খোলার আয়োজন করতে চান।

বাস্তবতাকে বুঝতে না পারলে সিদ্ধান্ত নিতে অবশ্যই ভুল হবে। বাস্তবতা হচ্ছে তখনকার দিনের মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল দেশের একমাত্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এখন মাদ্রাসা শিক্ষার সেই অবস্থা ও অবস্থান নেই। কাজেই উপরের কথাগুলো শ্লোগান হিসেবে সুন্দর শুনালেও বাস্তবতার সাথে এর ব্যবধান আকাশ পাতাল। তাছাড়া মাদ্রাসায় যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি তৈরি করতে হয়, তাহলে দেশের এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বুয়েট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কি কাজের জন্য? কাজেই আমাদের যেসব সন্তান এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ছে তাদেরকেই এ যুগের ইবনে সীনা, আল ফারাবী, আল কিন্দী হয়ে বের হতে হবে?সেদিকে যাবার জন্যে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষায় সুন্দর ব্যবস্থাও আছে। যেমন মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম স্তর পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান এই দু'টি ধারার শিক্ষা চালু রয়েছে। কাজেই যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চতর স্তরে বিজ্ঞান বা অন্যান্য সাধারণ সাবজেক্টে পড়তে আগ্রহী তারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অধ্যয়ন করবে। আর যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায় তারা ফাযিল ও কামিল স্তরে গিয়ে হাদীস, কুরআন, ফিকাহ ও আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই পদ্ধতি বাদ দিয়ে যদি দুনিয়ার সব জ্ঞান মাদ্রাসায় পড়ানোর আস্ফালন করা হয়, তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষাকেই বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তির শিকার করা হবে। কাজেই কুরআন মজীদের উলিখিত আয়াত ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

হচ্ছেঃ কুরআন ও হাদীস শরীফ সরাসরি বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে এবং যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান বের করতে সক্ষম দ্বীন চরিত্র সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তৈরি করা এবং এর জন্য মৌলিক সাবজেক্ট হলো কুরআন, হাদীস, আরবী, সাহিত্য, ফিকাহ, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি।

এবার আমরা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে সিলেবাস নির্দেশ করা হয়েছে তার দিকে নজর দেব। দেখব যে, এই সিলেবাস কি বর্তমান সিলেবাস অপেক্ষা উত্তম? নমুনা স্বরূপ দাখিল পরীক্ষার্থীদের সিলেবাস ও মানবন্টনের যে উদাহরণ শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে তার তুলনায় কি অধিকতর উন্নত? নাকি তাতে মাদ্রাসার ধর্মীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র নস্যাৎ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রস্তাবিত সিলেবাসের প্রতি সংক্ষেপে নজর দিতে চাই। কমিটি ১ম ও ২য় শ্রেণীতে স্কুল ও মাদ্রাসায় আবশ্যিক রেখেছে প্রতিটি ১০০ নম্বর করে বাংলা, গণিত ও ইংরেজিতে ৩০০ নম্বর। অতিরিক্ত বিষয় রেখেছে স্কুলে ললিতকলা (গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি) আর মাদ্রাসায় আরবী ১০০ নম্বর। লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, আরবী একটি ভাষা। অথচ প্রথম থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য কুরআন মজীদ, ফিকাহ, আকাইদ ও ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা অনিবার্য শর্ত। কমিটি এর প্রতি অবহেলা দেখিয়েছেন। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য কমিটির প্রস্তাবিত সিলেবাস হচ্ছে, মাদ্রাসা ও স্কুলের জন্য বাংলা ১০০, গণিত ১০০, ইংরেজি ১০০, বাংলাদেশ স্টাডিজ ১০০, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ১০০, মোট ৬০০ নম্বর। অতিরিক্ত বিষয় রাখা হয়েছে স্কুলের জন্য ললিতকলা/ ইংরেজী মাধ্যমের জন্য তাদের উপযোগী বিষয় ১০০ নম্বর। আর মাদ্রাসার জন্য ৩০০/৪০০ নম্বর। বিষয় ঃ কুরআন ও তাজবিদ ১০০, আরবি ১ম পত্র ১০০, আকাইদ ও ফিকাহ ১০০ এবং আরবি ২য় পত্র (শুধুমাত্র ৫ম শ্রেণীতে) ১০০ নম্বর। লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, এই স্তরে মাদ্রাসার আরবী ও ইসলামী বিষয়গুলো আবশ্যিক হওয়া চাই। কিন্তু কমিটি তা অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছে। এছাড়া একই স্তরে স্কুলের ছাত্ররা যেখানে মাত্র ১০০ নম্বর অতিরিক্ত পড়বে, সেখানে মাদ্রাসার ছাত্ররা ৩০০ বা ৪০০ নম্বর অতিরিক্ত পড়বে কোন দুঃখে?

বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে একটি নতুন বিষয়ের প্রস্তাবনা করে কমিটি কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। আমাদের বিবেচনায় যেই লাউ সেই কদু। দীর্ঘদিন হতে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান, পৌরনীতি,পরিবেশ পরিচিতির মত সাবজেক্টগুলো স্কুল মাদ্রাসায় চালু আছে। সেগুলোকে বাংলাদেশ স্টাডিজের নতুন মোড়ক দিয়ে বরং সংকোচিত করা হয়েছে। কারণ ইতিহাস ভূগোলে বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রেণীভেদে উপমহাদেশ, বিভিন্ন মহাদেশ পরিচিতি শিক্ষা চালু আছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্টাডিজ বলতে এই জ্ঞান বাংলাদেশের গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকার যুক্তি দেখানো যাবে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে মাদ্রাসার জন্য প্রস্তাবিত সিলেবাস মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বরং অপুষ্টিতে পঙ্গুত্ব বরণ করতে বাধ্য করার ব্যবস্থা। প্রাইমারী শিক্ষার ঐতিহ্য ভেঙ্গে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রলম্বিত করার প্রস্তাবটি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অযৌক্তিক। যাই হোক, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য আগের ৩টি ক্লাসের মতো ৬০০ নম্বর আর সাধারণ বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি ১০০ + কর্মমুখী শিক্ষা ১০০ মোট ৮০০ নম্বর স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য আবশ্যিক। অতিরিক্ত বিষয় রাখা হয়েছে স্কুলে ললিতকলা ১০০ আর মাদরসাার জন্য কোরআন ১০০, আকাইদ ফিকাহ ১০০, আরবী ১০০। এখানেও প্রশ্ন হলো স্কুলের ছাত্ররা ১০০ নম্বরের অতিরিক্ত বিষয় পড়লে মাদ্রাসা ছাত্ররা ৩০০ নম্বর কেন পড়বে? তদুপরি এই ৩০০ নম্বরের লেখাপড়া করে কোনো ছাত্রছাত্রী কি ভবিষ্যতে আলেম হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে? এছাড়া আবশ্যিক ৮০০ নম্বরের মধ্যে বাংলা, ইংরেজী, গণিত ছাড়া বাকী বিষয়গুলো কি কুরআন, আকাইদ, ফিকাহ ও আরবির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যে কারণে এগুলোর জন্য ৫০০ নম্বর বরাদ্দ আর আবশ্যিক করা হলো আর কুরআন আকাইদ, ফিকাহ ও আরবীকে গণ্য করা হলো বাড়তি বিষয় হিসেবে?

প্রাইমারীর পর দ্বিতীয় স্তর হলো মাধ্যমিকের, মাদ্রাসায় দাখিল। বলা হয়েছে এ স্তর হবে চার বছরের। বর্তমান ৯ম ও ১০ আর কলেজের ১১দশ ও ১২দশ শ্রেণী নিয়ে চার বছর মেয়াদী মাধ্যমিক। তাতে জেনারেল ধারার আলাদা কলেজ থাকছে না। আর মাদ্রাসায় আলেম স্তর থাকবে না। কি চমৎকার ব্যবস্থা! যে আলেম হওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা। সেই আলেম পরিভাষা যুক্ত স্তরটিই তুলে দেয়া হবে। তার পরের স্তর ফাযিল, কামিল বা বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিক স্তরের চার বছরকে এক করে দেখালেও দুই দুই বছরের জন্য আলাদা সিলেবাস এবং পরবর্তী দুই বছরের মেধাবীদের বৃত্তি নির্ধারণের জন্য ১০ম শ্রেণীতে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষা পাবলিক বা সাধারণ পরীক্ষা হবে না। হবে বৃত্তি পরীক্ষা। কারণ, পাবলিক পরীক্ষাটি ১০ম থেকে ৮ম শ্রেণীতে নিয়ে আসা হচ্ছে। এর পেছনে কারণ একটিই। সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে মাধ্যমিকের আবশ্যিক ইসলামিয়াত/ধর্ম শিক্ষাটি বিলুপ্ত করা। দেখা যাক, এই চার বছরে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কি ধরনের সিলেবাস প্রস্তাব করা হয়েছে। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ৮০০ নম্বরের আবশ্যিক সাবজেক্টের মধ্যে মাদ্রাসার জন্য রাখা হয়েছে আল কুরআন ১০০, হাদিস ও ফিকাহ ১০০, আর আরবি ১০০। মাদ্রাসার জন্য ১০০ বেশী। কারণ এ স্তরে স্কুলের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে ৭০০। এরপর ১৯টি ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্য হতে ১০০ নম্বর। যার

www.pathagar.com

মধ্যে ৩টি ইসলামী বিষয় হলো (১৫) ইসলামের ইতিহাস, (১৭) ফিকাহ ও আকাইদ এবং (১৮) আল হাদিস। মাদ্রাসার বিজ্ঞান, সাধারণ ও ব্যবসায় শাখার জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলো নিয়ে আর খুটিনাটি আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি না।

১১দশ ও ১২দশ শ্রেণীর জন্য প্রস্তাবিত সিলেবাসের অবস্থাও ব্যতিক্রম নয়। এই স্তরে জেনারেল শিক্ষার আবশ্যিক বিষয় ৬০০। মাদ্রাসার জন্য ৮০০। মাদ্রাসায় পড়ে কেন, তার জন্য হয়ত ২০০ নম্বর বেশী। এই ২০০ নম্বর হচ্ছে আল কুরআন ও আল হাদীসের। মাদ্রাসার মানবিক শাখার জন্য নৈর্বাচনিক বিষয় রাখা হয়েছে ৬০০। বিজ্ঞান শাখার বিষয়গুলো বিজ্ঞান বিষয়ক। মানবিক শাখার ৬০০ নম্বরের মধ্যে মানবন্টন এরূপ: ফারায়েজ, ফিক্বহ ও উসুলে ফিক্বহ ১০০, আরবী ১০০, ইসলামের ইতিহাস ২০০ ও বালাগাত মানতিক ২০০। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে সামান্য জানাশুনা যাদের আছে তাদের দৃষ্টিতে এই মান বন্টন কত অবিচেনাপ্রসূত, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি নাকি এই মান বন্টনে ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেছে। তাই আমরা কথা বাড়াব না। মেনে নিলাম যে, মাদ্রাসা ও আরবি বিষয়ে তাদের ভুল হওয়ার যুক্তি আছে। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ড ও পরবর্তী ফাযিল কামিল নিয়ে যা করা হয়েছে, তার পেছনে কি কোন অজুহাত দেখাতে পারবেন? বলা হয়েছে, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যথা ইংরেজি, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় (কলা, কারিগরি শিক্ষা) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড বা প্রস্তাবিত তথ্য প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিল। ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন মাদ্রাসা বোর্ডের দায়িত্বে থাকবে।

এই প্রস্তাব মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি চরম অবমাননাকর এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় বিভাজন করে মাদ্রাসা বোর্ডকে দুর্বল ও অকেজো করে দেয়ার এক মারাত্মক সুপারিশ। অথচ হয়ত চোখে ধুলো দেয়ার মানসিকতা নিয়ে এই মাদ্রাসা বোর্ডকেই ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার হাস্যকর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার (৬) ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে। এই উচ্চ পর্যায় বলতে ফাযিল ও কামিল। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিগত সরকারের আমলে পার্লামেন্টে বিল পাসের মাধ্যমে ফাযিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তরের মান দেয়া হয়েছে। সর্ব মহলের দাবি ছিল একটি পৃথক এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই মান দেয়া হোক। কিন্তু

www.pathagar.com

তৎকালীন সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। সে অনুযায়ী ফাযিলের পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল কামিলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের মান এর ব্যাপারটি চূড়ান্ত ও মীমাংসিত বিষয়। অথচ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ধুম্রজাল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেছে যে, "..(এ পর্যায়ের) ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে।' কমিটি বলতে পারত যে, বর্তমান কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ফাযিল কামিল মাদ্রাসাগুলোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে। তার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এ দায়িত্ব মাদ্রাসা বোর্ডকে ন্যস্ত করা হবে। অথচ একটু আগেই আমরা দেখেছি যে, ইবতেদায়ী ও দাখিলের জেনারেল সাবজেক্টগুলোর পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডকে বিশ্বাস করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে যে, এগুলো ন্যস্ত করা হবে স্কুল বোর্ড বা কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ওপর। এই ব্যবস্থায় ফাযিল কামিলের ডিগ্রি একেবারেই খেলো হয়ে যাবে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অপর যে প্রস্তাবটির সাথে আমরা কিছুতেই একমত হতে পারি না, তা হচ্ছে স্কুলের বইগুলো হুবহু মাদ্রাসায় চালু করা। এতদিন ইংরেজি, বাংলা, গণিত, সমাজ প্রভৃতি জেনারেল বিষয়ের বই মাদ্রাসা বোর্ড রচনা ও প্রকাশ করে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বীনি ভাবধারা, মেজায ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিচর্যার জন্যে এই ব্যবস্থা। তবে বইগুলোর মান ও কলেবর স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের একই রূপ। আমরা জানি, স্কুলে বাংলা, ইংরেজি, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের ভাবধারা ইসলাম সম্মত হওয়ার শর্ত নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীতও হতে পারে। যা কোনো অবস্থাতেই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।স্কুলে গণিতের ক্ষেত্রে কত টাকায় কত সুদ এর অংক শেখানো হয়। মাদ্রাসায় হারাম সুদের হিসাব শেখানো ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। তাই এই হিসাব শেখানো হয় কত টাকায় কত যাকাতের অঙ্ক দিয়ে। এই ব্যবস্থা তুলে দেয়ার মানে হবে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আদর্শিক দেউলিয়াত্বের পথে ঠেলে দেয়া। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে যারা জড়িত এবং এর দ্বীনি স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য যারা রক্ষা করতে চান, তারা কিছুতেই এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন না। হ্যাঁ, মাদ্রাসা বোর্ড প্রণীত বইগুলোর মান যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা, তা জাতীয় টেক্সবুক বোর্ড নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাতে কোনোরূপ সমস্যাও হবে না।

একজন প্রাক্তন মাদ্রাসা ছাত্র ও ইসলামের অনুসারী এদেশের সন্তান হিসেবে বলতে চাই যে, আমাদের ঈমান ও আমলের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা জড়িত,

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশে ইসলামের বাহন ও পরিচর্যাকারী। এ কারণেই এই শিক্ষা নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা ও লেখালেখি। আমাদের সুচিন্তিত মত হচ্ছে, আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষা দাখিল ও আলিম স্তরে বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাতে সংস্কারের প্রয়োজন নেই। ফাযিল ও কামিল স্তরে এর উন্নয়ন করাই কাম্য। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাদ্রাসার প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করেছে বলে আমাদের মনে হয় না। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নৈর্বাচনিক সিলেবাসে ২০০ নম্বর বালাগাত ও মানতিক এর জন্য বরাদ্দ করার ভুলটি এর প্রমাণ দেয়। মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের অনিবার্য শর্ত হিসেবে ফাযিল ও অনার্স কোর্স চালুর দাবি জানিয়ে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল 'ড. কুদরত-ই- খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে ৩রা জুলাই ২০০৯। বলেছিলাম, ফাযিলে অনার্স চালু না হলে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব থাকবে না। ছাত্ররা আলিমের পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবে। ফাযিলে পাস কোর্স পড়ার জন্য মাদ্রাসায় পড়ে থাকবে না। সৌভাগ্যবশতঃ আগস্ট ২০০৯ এর প্রথম সপ্তাহে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফাযিলে অনার্স কোর্স চালুর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে বলে পত্রিকায় নিউজ দেখেছি। প্রত্যাশা ছিল, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ন কমিটি এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবে, অথচ জানায় নি। কমিটি যেসব কলেজে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু আছে সেখানেও ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করার প্রস্তাব করেছে। অথচ মাদ্রাসার বেলায় সে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করে নি। এ অবস্থায় মাদ্রাসার বেলায় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, তাতে মাদ্রাসা শিক্ষার অনিবার্য বিলুপ্তি ঘটবে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে কওমী মাদ্রাসাগুলোতেও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত একই ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে বলে একাধিকবার বলা হয়েছে। এর পরিণতিও যে একই হবে তা বলাই বাহুল্য।[২]

[২] প্রকাশ : উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ মার্চ ২০১০।

www.pathagar.com

মাধ্যমিকে ইসলামিয়াত শিক্ষা বিলুপ্তির পরিণাম

বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বাধিক আলোচিত ইস্যু জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর চূড়ান্ত খসড়া। এ শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে আলোচনা পর্যালোচনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষানীতিতে সাধারণ শিক্ষার বর্তমান ক্লাস বিন্যাসে পরিবর্তনের প্রস্তাবে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির আশংকা করছেন অনেকে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে সংস্কারের নামে যে আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তাতে উপমহাদেশের দীর্ঘ ৮০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রায় সবাই উদ্বিগ্ন। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালে প্রাদেশিক সরকারের এক ঘোষণায় ১০৭৪টি নিউ স্কীম মাদ্রাসা রাতারাতি স্কুল-কলেজে পরিবর্তিত হওয়ার স্মৃতি বা ইতিহাস যাদের মনে আছে তাদের উদ্বেগ আশংকাই সবচে বেশী। জনগণের উদ্বেগ ও সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত না করার যে মনোভাব সরকারী মহল দেখাচ্ছেন তাতে উপরোক্ত আশংকাটি দিনদিন আরো বদ্ধমূল হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে তা যে কোনো সময় মাঠে ময়দানে আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। যার কুলভাঙ্গা জোয়ার সামাল দেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, এদেশের মানুষ সব ধরনের বিপদ বিপর্যয়, এমনকি অত্যাচার স্বৈরাচারকেও সহ্য করতে পারে। কিন্তু যখন মনে করে যে, ঈমান ও ইসলামের উপর আঘাত হানা হচ্ছে তখন পরিণতির কথা না ভেবেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা আশা করব, সরকার আগেভাগে বিষয়টি বুঝবেন এবং জনগণকে বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামতে উৎসাহ দান হতে বিরত হবেন।

শুরুতে এসব কথা বলার কারণ হচ্ছে বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে, যিনি আযান নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করায় ধর্মপ্রাণ জনগণের কাছে একজন নিন্দিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তিনজন মূল দায়িত্বশীল ব্যক্তিই দেশে বামপন্থী হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং ধর্মপ্রাণ জনগণ তাদেরকে ভাল চোখে দেখার মতো কোন কাজ তারা দেখাতে পারেন নি। এসব কারণে নিয়োগ দানের শুরুতেই তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড়

www.pathagar.com

উঠেছিল। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেন নি। অপর দিকে এই তিন ব্যক্তি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের নিরিখে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন বলে বারবার উল্লেখ করায় লোকেরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেশ স্বাধীন হবার পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে প্রণীত হলেও জনগণের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিরোধী এবং বিদ্যমান বাস্তবতা বর্জিত হওয়ায় স্বয়ং উদ্যোক্তারাও তা বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগী হননি। প্রণয়নের পর গত ৩৫ বছরের ব্যবধানেও তা কার্যকর হয়নি। কাজেই পুরনো দিনের একটি অকেজো সুপারিশমালার আলোকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাবনা জাতিকে পেছন দিকে নিয়ে যাওয়ার কুপমন্ডুকতা ছাড়া আর কি হতে পারে। কথায় বলে ভুতের পা পেছন দিকে। ভূত চলে পেছন দিকে। আর মানুষ চলে সম্মুখ পানে। শাসক দলীয় নেতারা গোটা জাতিকে ভূত বানানোর চিন্ত া কিভাবে করতে পারেন তা আমাদের বুঝে আসে না।

এ জাতীয় সমালোচনার প্রতি তোয়াক্কা না করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর চূড়ান্ত খসড়াটি গত ২রা সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হয়। এরপর সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে বলা হয় যে, ৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আগ্রহী যে কেউ এ শিক্ষানীতি সম্পর্কে ই-মেইলের মাধ্যমে মতামত জানাতে পারবেন। পরে মতামত জানানোর সময়সীমা ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বলা হয় যে, ২০১০ সালের জানুয়ারি হতে তার বাস্তবায়ন শুরু হবে। জাতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের মত দূরূহ, জটিল ও সময় সাপেক্ষ একটি বিষয়কে এমন তাড়াহুড়ায় সম্পন্ন করার প্রবণতা দেখে স্বভাবতই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে। অনেকে বলছেন যে, এতে লুকোচুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কারণ শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করে এমন সময় ওয়েব সাইটে দেয়া হয় যখন দেশে রমযানের ব্যস্ততা ও ঈদের ধুম। (ঈদ ঃ ২১ সেপ্টেম্বর) মতামত জানানোর জন্যে দেয়া সময়টিতে ঈদ ও পূজোর ছুটি ও তার রেশ অব্যাহত ছিল। তাছাড়া আমাদের দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার এখনো নতুন। সর্বস্তরের আগ্রহী লোকদের পক্ষে ওয়েব সাইট সার্চ করা সহজলভ্য নয়; মতামত দেয়ার ব্যাপারটি তো আরো খানিকটা জটিল। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি দাবি করেছেন যে, তারা শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ৫৬টি সংস্থা ও সংগঠনের সাথে বিস্তারিত মত বিনিময় করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কমিটি যে সব সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে বলে দাবি করেছে সেগুলোর নামও খসড়া শিক্ষানীতির কোথাও উল্লেখ নাই । রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্জ প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ শিক্ষানীতি প্রণয়নে এমন তাড়াহুড়া ও লুকোচুরির

www.pathagar.com

সমালোচনা করে জাতীয়ভাবে ব্যাপক ভিত্তিক জনমত গঠনের জন্য দুই বছর বা অন্তত এক বছর সময় দেয়ার দাবি করেছেন। আমাদের দাবি হলো, সর্বাগ্রে শিক্ষানীতির খসড়াটি বই আকারে ছাপিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনোরূপ অস্বচ্ছতা না থাকে এবং সবাই স্বাচ্ছন্দে সুচিন্তিত পরামর্শ দিতে পারেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে লক্ষ্যনীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য বা দিকটি হলো সাধারণ শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস ভেঙ্গে দেয়া। বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে ৮ বছর মেয়াদী । বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী। এরপর ছেলেমেয়েরা ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পড়ে হাই স্কুলে বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তারপর দুই বছর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পড়ে কলেজ জীবনে। প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে যে, মাধ্যমিক স্তর হবে প্রাইমারী ৮ম শ্রেণীর পর ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্রেণী অর্থাৎ হাইস্কুলের নাইন টেন ও কলেজ নিয়ে চার বছর। এ ব্যবস্থাপনায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বা কলেজ থাকবে না। কলেজ হাই স্কুলের আওতায় চলে আসবে। বর্তমানে মেট্রিকে যে পাবলিক পরীক্ষা হয় তার পরিবর্তে ৮ম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা হবে আর স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে শেষ পরীক্ষা হবে মাধ্যমিক হিসাবে ১২শ শ্রেণীর পর। তবে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি নির্ণয়ের জন্য ১০ম শ্রেণীতে একটি পরীক্ষা হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে ইন্টারপাশ করার জন্য প্রাইমারী ৫+ হাইস্কুল ৫+ কলেজ ২ = মোট ১২ বছর লেখাপড়া করতে হয়। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রাইমারী ৮ + মাধ্যমিক ৪ = মোট ১২ বছর লেখাপড়া করতে হবে। অর্থাৎ ক্লাসের বছরে বা সংখ্যায় কোন হেরফের নাই। শুধু ১টি পরীক্ষার স্থানান্তর করতে হবে। অর্থাৎ বর্তমানে ১০ম শ্রেণীতে যে পরীক্ষা নেয়া হয় তা প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ৮ম শ্রেণী শেষে নেয়া হবে। আর কলেজে এসে হাইস্কুলের পেটের ভেতর ঢুকে যাবে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি যদি এমন কোনো ব্যবস্থা দিতেন, যাতে ক্লাসের সংখ্যা হ্রাস পায় বা ছাত্রছাত্রীদের শ্রম-আয়াশ কম হয় বা সহজ হয় তাহলেও কথা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, যদি বলা হত যে, ১২ বছরের যে লেখাপড়া তা প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ৮ বছর বা ১০ বছরে শেষ করা হবে। কিংবা ১২ বছরের মধ্যে ১৪ বা ১৬ বছরের জ্ঞান ঢুকিয়ে দেয়া হবে। নাহ্, এ ধরনের কোনো প্রস্তাবনা বা সুপারিশ এখানে নাই। শুধু টানাহেঁচড়া হচ্ছে ১০ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষাটি ৮ম শ্রেণীতে নেয়ার জন্য। বর্তমান মেট্রিকের পাবলিক পরীক্ষায় কি কি অসুবিধা আছে বা ৮ম শ্রেণীতে নিলে কি কি সুবিধা হবে তাও শিক্ষানীতির কোথাও উল্লেখ নাই। এরপরও তারা এই পরিবর্তনটা আনতে চান। এর হেতু আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। একটি পাবলিক পরীক্ষা ১০ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে আনতে হলে জাতিকে কি

www.pathagar.com

খেসারত দিতে হবে এবং কি ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে, জানিনা তারা তা চিন্তা করে দেখেছেন কিনা।

ধরুন, বর্তমান প্রাইমারী শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাড়ানো হলো। শুধু মুখের কথায় তো চিড়া ভিজবে না। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ক্লাসের জন্য ক্লাসরুম বাড়াতে হবে। বর্তমানে সকল প্রাইমারী ও হাইস্কুল তো পাশাপাশি নেই যে, মনে করুন, হাইস্কুলের তিনটি ক্লাসের সীমানায় বেড়া টেনে দিয়ে প্রাইমারী বানোনো যাবে। শ্রেণীকক্ষ বাড়াতে হলে স্কুলের জায়গা থাকা লাগবে। তারপর ব্যয় বহুল নির্মাণ কাজ। এরপর আসে হাই স্কুলগুলোতে ১১শ ও ১২শ শ্রেণী চালু করার জন্য শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের প্রশ্ন। হয়ত বলা হবে যে, প্রথম তিনটি ক্লাস প্রাইমারীতে চলে আসার ফলে সৃষ্ট শূণ্য রুমগুলোতে কলেজের ছাত্ররা এসে লেখাপড়া করবে। তা হবে একটি বাড়তি পাওনা। তাহলে বর্তমান কলেজগুলো তো শূণ্য খাঁ খাঁ করবে, অকেজো হয়ে পড়বে। এই অনর্থক ভাঙ্গাগড়ার জন্য শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিকসহ ভৌত সুবিধা তৈরি করতে বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে (এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ) ৬টি কক্ষ এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী চালু করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে (সম পর্যায়ের মাদ্রাসাসহ) ৩টি করে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরি করতে হবে। এতে ৫৬ লক্ষ ১৮ হাজার শ্রেণী কক্ষের জন্য ব্যয় হবে ৪৩ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। আর এই খাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৮ হাজার কোটি টাকা (স্মারণী-১, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯)। সেটি বাস্তবায়িত হলে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে প্রায় সমস্যংখ্যক শ্রেণী কক্ষ অব্যবহৃত হয়ে পড়বে। আমাদের প্রশ্ন, শুধুমাত্র ১০ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষাটি ৮ম শ্রেণীতে আনার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মানে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয়ের পেছনে কোনা যুক্তি আছে কি?

এরপর আসে শিক্ষকের প্রশ্ন। প্রাইমারীর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ৩ ক্লাস অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ৮ম এর জন্য অতিরিক্ত শিক্ষকরা কোত্থেকে আসবেন? হাই স্কুলের ছাত্রশূণ্য ক্লাস তিনটির শিক্ষকদের কি পদাবনিত ঘটিয়ে প্রাইমারীতে নিয়ে আসা হবে? সেই প্রক্রিয়া কি এত সহজ? যদি বলা হয় যে, প্রাইমারীতে বিপুল সংখ্যক নতুন শিক্ষক নেয়া হবে। তাহলে হাই স্কুলের লাখ লাখ শিক্ষক কি বেকারের খাতায় নাম লেখাবেন না? আর যদি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এনে হাইস্কুল ভরপুর করার কথা বলা হয় তাহলে কি এখানকার শিক্ষকরা কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারবেন? তখন মাধ্যমিকেও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য নতুন শিক্ষক প্রয়োজন হবে। একদিকে লাখ লাখ শিক্ষককে বেকারের সারিতে ঠেলে দিয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ কতখানি মানবিক ও যুক্তিযুক্ত হবে? আবার কলেজের

www.pathagar.com

শিক্ষকদের অবস্থা কি দাড়াবে? তাদের তো ছাত্রছাত্রী হারিয়ে হাপিত্যেস করা ছাড়া উপায় থাকবে না। যদি কলেজগুলোতে নতুন করে মাধ্যমিক চালু করার কথা বলা হয়, তাহবে এক দীর্ঘ মেয়াদী জটিল ও ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া।

এতো গেল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষক মহোদয়দের নিয়ে ট্রাফিক জ্যামের অকল্পনীয় সমস্যার কথা। ছাত্রীছাত্রীদের কি অবস্থা হবে? সরকারী হিসাব মতে বর্তমানে প্রাইমারীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লাখ। ১০ পার্সেন্ট এখনো স্কুলে যায় না। আবার ৫ম শ্রেণী পার হবার আগে নানা কারণে প্রায় অর্ধেক ঝরে পড়ে। সরকার সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলছেন। আমাদের প্রশ্ন, বর্তমান ব্যবস্থায় ৫ম শ্রেণীতে যেতে না যেতে যেখানে শতকরা ৫০ ভাগ ঝরে পড়ছে সেখানে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারীতে উন্নীত করে সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা কি সম্ভব হবে? এতে আমাদের শিশু-কিশোরদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ারও একটা কুটকৌশল রয়েছে। ক্লাস ফাইভ পাশ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যখন সিক্সে ওঠে তখন তাদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। তাদের মনোবল চাঙ্গা হয় নতুন উদ্যমে। জীবনের ভবিষ্যত নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর হয় অব্যক্ত ব্যক্তিত্ব চেতনায়। কাজেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দীর্ঘ ৮ বছর প্রাইমারী ছাত্রীছাত্রীদের কাছেও বিরক্তিকর। যুক্তি বুদ্ধিরও অবাস্তর। শিক্ষাবিদরা বলছেন যে, পৃথিবীর কোথাও ৮ বছরের প্রাইমারী শিক্ষার নজির নাই। এই নজির বিহীন আবিস্কারের কৃতিত্ব একান্তই আমাদের ত্রিরত্ন ট্রায়াঙ্গল শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির।

বর্তমান ব্যবস্থায় ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা হয়। ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষাকে মূল্যায়ন পরীক্ষা হিসেবে নেয়া হয়। ১০ম শ্রেণীতে এস এস সির পাবলিক পরীক্ষা। তারপর কলেজে দু বছর। হাইস্কুল পার হয়ে কলেজের বারান্দায় পা দিলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যে নতুন অনুভূতি, প্রচণ্ড মনোবল ও ভবিষ্যতে বড় হবার স্বপ্ন খেলে যায়, সে অভিজ্ঞতা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ বোধ হয় ভুলে গেছেন। নচেত কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক গর্বিত পরিচয় কেড়ে নেয়া বা মাদ্রাসার আলেম ক্লাস বিলুপ্ত করার সাহস তারা জেনে শুনে করতে পারতেন না। অথচ আলেম হওয়ার জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষার এত আয়োজন, এত সাধনা।

এসব ছাড়াও সাড়ে ৪৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে যে তোড়জোড় সারাদেশে শুরু হবে তাতে টেন্ডারবাজি নিয়ে হানাহানি, খুনাখুনি গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রোধ করার শক্তি কি আছে? আমাদের প্রশ্ন শুধুমাত্র মেট্রিকের পাবলিক পরীক্ষাটি ৮ম শ্রেণীতে নিয়ে আসার জন্য শ্রেণী কক্ষ,

www.pathagar.com

শিক্ষক, ছাত্র ও সমাজের জন্য এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রস্তাবনার পেছনে কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে বলে কি আমরা মনে করতে পারি?

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রস্তাবনায় বিদেশের প্রতি তোয়াজ দেখে আমাদের অবাক হতে হয়। দেশের শিক্ষা কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করার কথা বললেও তারা বিদেশী শিক্ষার বেলায় যেন অসহায়। এক দেশে দু'ধরণের শিক্ষা কিভাবে চলবে এবং ১০ম ও ১২শ শ্রেণীর পরীক্ষা বিদেশী ধারায় মান সম্পন্ন হলেও আমাদেরটা কেন ওলটপালট করতে হবে তার জবাব কিন্তু কমিটি দেয় নি। কমিটির সুপারিশ হলো 'ও' লেভেল ও 'এ' লেভেল শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশী ধারায় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে এ শিক্ষা পরিচালিত হবে এবং 'ও' লেভেলকে দশম শ্রেণী ও 'এ' লেভেলকে দ্বাদশ শ্রেণীর সমমান হিসেবে গণ্য করা হবে। (জাতীয় শিক্ষা নীতি পৃ. ২৩) এ ব্যবস্থায় তাদের ৮ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার কি অবস্থা হবে সে জবাব তারা দেননি।

আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে, এমন নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনার পেছনে সরকারের সমর্থন আছে। কারণ সরকার একটা ভাল কিছু করার জন্য তাদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞজনদের একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। তা এখনো খসড়া পর্যায়ে আছে। মন্ত্রী সভায় এখনো পর্যালোচনা হয়নি এবং সংসদেও বিল আকারে উত্থাপিত হয়নি। তাই তারা যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন, তাতে স্ববিরোধীতা ও অসংলগ্নতার বিভৎস রূপ আমাদের সামনে ধরা পড়েছে। এগুলো আমরা পরামর্শ আকারে সরকারের কাছে তুলে ধরতে চাই। আমাদের প্রত্যাশা ও দাবি হলো, সরকার বাস্তবতাকে সামনে রাখবেন। এ বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দিলে কারো জন্য ভাল হবে না। যারা বাম রাজনীতি করেন সাধারণত তাদের আদর্শ থাকে, চরিত্র থাকে, সহজে নীতিহারা হন না। কিন্তু দেখা গেছে, উপরে উপরে ভাসমান কতক বাম ব্যক্তিত্ব আদর্শ হারিয়ে সুবিধা শিকারি হয়ে যান। তারা পরের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খান। তাদের পরিচয় বুদ্ধিজীবি, আসলে তারা পরজীবী। বিএনপির ঘাড়ে সওয়ার একজন নামীদামী পরজীবি জিয়া পরিবারের জন্য কি ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছিলেন তা সবার চোখের সামনে। ১৪ দলের কয়েকজন বাম ব্যক্তিত্বও সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছেন কিনা, ভাবতে পরামর্শ দিতে চাই। কারণ একটি পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে টানাহেঁচড়া করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পুরো জাতি ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে নৈরাজ্যের মাঝে ঠেলে দেয়ার চিন্তা তারা কিভাবে করতে পারলেন? তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা চিন্তা করে কুল কিনারা পাইনি।

তখনো শিক্ষানীতির খসড়া ওয়েব সাইটে আসেনি। পত্র পত্রিকায় পাইমারী শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হবে মর্মে খবর বের হচ্ছিল। ভাবছিলাম কেন, কি উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

এমনটি করা হচ্ছে? হঠাৎ মাথায় আসল একটি চিন্তা, অজানা আশংকা। সে চিন্তাটিই কাগজে নামিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইনকিলাবে। শিরোনাম ঃ 'ধর্ম ভিত্তিক কর্মমুখী জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চাই।' সেদিনের চিন্তাটিকে বর্তমানের সাথে মিলানোর জন্যে একটু উদ্বৃতি টানতে চাই।

'বলা হচ্ছে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীকে ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। তাতে বর্তমানের ন্যায় ১০ম শ্রেণীর পর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা থাকবে না। পরীক্ষা হবে একেবারে ১২শ ক্লাসের পর ইন্টারমিডিয়েটে। এখানে আমাদের একটি বড় জিজ্ঞাসা হচ্ছে, বর্তমানে ১০ম শ্রেণীতে এসএসসি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াতের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রস্তাবিত নিয়মে এই ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত পরীক্ষা ইন্টারে গিয়ে বহাল থাকবে কিনা? যদি না থাকে তাহলে এমন চিন্তা করার অবকাশ সৃষ্টি হবে যে, হয়ত এসএসসি স্তর হতে ১০০ নম্বর ইসলামিয়াত বিলুপ্ত করার কৌশল নিয়ে এই নতুন শ্রেণী বিন্যাসের ছক আঁকা হয়েছে। এমন আশংকার কারণ হচ্ছে, ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ৩ মাসের জন্য ক্ষমতায় আসে তখন অন্যসব কর্তব্য কাজ বাদ রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, মেট্রিকে ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত পরীক্ষা হবে ৫০ নম্বরে। জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চেতনা ও চরিত্র বিধ্বংসী এমন সিদ্ধান্তটি কে বা কারা নিয়েছিল তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে সেই গভীর চক্রান্তের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে গোটা জাতি রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে পরবর্তী সরকার সে সিদ্ধান্ত বহাল রাখেনি। প্রস্তাবিত নীতিমালা নিয়ে যারা মাথা ঘামাচ্ছেন তাদেরকে ব্যাপারটি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যথায় মাধ্যমিকে ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত বাদ দেয়া হলে একে গোটা দেশবাসী জাতির ধর্মীয় চেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে করবে এবং তার পরিণতি অবশ্যই সুখকর হবে না।' (উপ-সম্পাদকীয়,দৈনিক ইনকিলাব ২৬ আগস্ট, ২০০৯)

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিকের আবশ্যিক ইসলামিয়াত বিলুপ্ত করে ধর্ম শিক্ষাকে অসংখ্য ঐচ্ছিক বিষয়ের মাঝে গুলিয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে আগে পরে সংগতিহীন এ বিষয়টি অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে নিতেও পারে। এভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি স্কুল ও মাদ্রাসার সিলেবাস নিয়ে যে সব সুপারিশ করেছে, তা আরো বেশী জগাখিচুড়ি, অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী।[৩]

---

[৩] প্রকাশ : উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৪ নভেম্বর ২০০৯। জাতীয় কনভেনশন স্মারক ০৯, ইসলামী মিক্ষা রক্ষা কমিটি ২২/১২/২০০৯।

www.pathagar.com

ধর্মভিত্তিক কর্মমুখি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চাই

সরকারী মহল থেকে বারবার সর্বস্তরে একমুখি শিক্ষা চালুর কথা বলা হচ্ছে। আমাদের মতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একমুখি হওয়া ভাল, যাতে দেশের সকল মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যে সমন্নয় থাকে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি মজবুত হয়। কিন্তু একমুখি শিক্ষার নামে অভিন্ন পদ্ধতির ; বিশেষ করে জনগণের ধর্মীয় চেতনা ও ঐতিহ্য বিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলে অবশ্যই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। যা সামাল দেয়া কঠিন হবে।

এরূপ আশংকার কারণ হচ্ছে, দেশে বাম ঘরাণার নাস্তিক্যবাদী মতবাদের প্রবক্তা কয়েক জন বিশিষ্ট লোককে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা ৩৫ বছর আগে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রণীত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। যে রিপোর্টটি দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ জাতির পক্ষ হতে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ; এমন কি রিপোর্ট প্রণয়নের উদ্যোক্তা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানও তা বাস্তবায়ন হতে দেন নি, সেটি এখন কার্যকর বা অনুসরণের কথা বলার মানে হচ্ছে, সভ্য দুনিয়ার রীতির উল্টা পথে জাতিকে পেছন দিকে টেনে নেয়া। মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্কুল শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষাকে গলাটিপে হত্যা করার গভীর চক্রান্ত নিয়েই ঐ রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল। যে রিপোর্টের প্রতি মৃত্যুকালে মরহুম ড. কুদরত-ই-খুদা নিজেও আস্থাবান ছিলেন না বলে পারিবারিক সূত্রে পত্রিকান্তরে জানা যায়। কাজেই যারা জাতিকে এই ষড়যন্ত্রজালে আটকাতে চান তাদের আগপিছ ভেবে দেখা দরকার। পূর্বেকার ক্ষমতা চর্চাকারীদের জীবন থেকে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

গোটা জাতির পক্ষ হতে আমরা একটা কথা বলতে চাই যে, এদেশের মানুষ আস্তিক, ধর্ম বিশ্বাসী। গুটিকতক নাস্তিক থাকলেও খুঁজে বের করা মুশকিল হবে। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। বাকীরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্ম এই দেশের মানুষের চিন্তা, মনন ও আচরণের নিয়ামক। কাজেই এ দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে ধর্ম ভিত্তিক। জাতির বোধ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চেতনাকে অস্বীকার করা হলে বা আমাদের ছেলেমেয়েদের

www.pathagar.com

ধর্মহীন নাস্তিকরূপে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র করা হলে পরিণতি মোটেও ভাল হবে না। কাজেই আমরা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে ধর্মীয় শিক্ষা চাই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন ৭ বছর হয় তখন তাদেরকে নামায পড়ার জন্য আদেশ কর আর যখন বয়স দশ বছর হয় তখন (নামাযের প্রতি অবহেলা করলে প্রয়োজনে) শাসন কর।" (-আল হাদীস) স্বাভাবিকভাবেই ৭ বছরে নামাযের আদেশ করতে হলে তার আগে তাদেরকে নামায শেখাতে হবে। অর্থাৎ অন্তত ৫ বছর থেকেই এর প্রস্তুতি নিতে হবে। তার অর্থ দাঁড়ায়, প্রাইমারীতে ১ম শ্রেণী থেকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এ শিক্ষার মধ্যে থাকবে আরবী বর্ণমালা, ছোটখাট দু'আ-দরূদ, অযু গোসলের নিয়ম, পাকি নাপাকির ধারণা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সময়ানুবর্তিতা, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, সুরা কেরাত মুখস্ত করা, নামায শিক্ষা প্রভৃতি। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে এতটুকু ধর্মীয় শিক্ষার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে আমরা আপোষ করতে পারি না।

আজকে যারা সরকারী বেসরকারী বড় বড় দায়িত্ব পালন করছেন বা রিটায়ার্ড করেছেন তারা নিজেদের জীবনেই দেখতে পাচ্ছেন যে, ছোটবেলায় দু'আ, নামায, ওযু, গোসল, পাকি নাপাকির যে হাতে কলমে শিক্ষা পেয়েছেন বার্ধক্যে এসে এটিই আমাদের ভবিষ্যত জীবনের সম্বল, পরকালের পাথেয়। ছেলেমেয়েরা নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠুক, মৃত্যুর পর আমাদের জন্য তারা দু'আ করুক, এরূপ সুসন্তান চায় না– এমন মানুষ আমাদের সমাজে একজনও নাই। কাজেই ছোটবেলা থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় চেতনায় সুন্দর চরিত্র নিয়ে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও মননের সাথে সংগতিশীল রূপে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অধুনা নূরানী পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কুরআন শিক্ষার একটি চমৎকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। এটিকে প্রাইমারীতে আত্মস্থ করা যেতে পারে।

নতুন শিক্ষানীতিতে বর্তমান মাধ্যমিক বা হাইস্কুলের শিক্ষাকে ভাগ করে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীকে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে গণ্য করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীকে ১১শ ও ১২ শ শ্রেণীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। তাতে বর্তমানের ন্যায় ১০ম শ্রেণীর পর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা থাকবে না। পরীক্ষা হবে একেবারে ১২ শ ক্লাসের পর ইন্টারমিডিয়েটে। এখানে আমাদের একটি বড় জিজ্ঞাসা হচ্ছে, বর্তমানে ১০ম শ্রেণীতে এসএসসি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াতের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রস্তাবিত নিয়মে এই ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত পরীক্ষা ইন্টারে গিয়ে বহাল থাকবে কিনা? যদি না তাকে তাহলে

www.pathagar.com

এমন চিন্তা করার অবকাশ সৃষ্টি হবে যে, হয়ত এসএসসি স্তর হতে ১০০ নম্বর ইসলামিয়াত বিলুপ্ত করার গভীর কৌশল নিয়ে এই নতুন শ্রেণী বিন্যাসের ছক আঁকা হয়েছে। এমন আশংকার কারণ হচ্ছে, ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ৩ মাসের জন্য ক্ষমতায় আসে তখন অন্যসব কর্তব্য কাজ বাদ রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মেট্রিকে ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত পরীক্ষা হবে ৫০ নম্বরে। জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভবিষ্যত প্রজন্মের চেতনা ও চরিত্র বিধ্বংসী এমন সিদ্ধান্তটি কে বা কারা নিয়েছিল তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে সেই গভীর চক্রান্তের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে গোটা জাতি রাগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে পরবর্তী সরকার সে সিদ্ধান্ত বহাল রাখে নি। প্রস্তাবিত নীতিমালা নিয়ে যারা মাথা ঘামাচ্ছেন তাদেরকে ব্যাপারটি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যথায় মেট্রিকে ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত বাদ দেয়া হলে একে গোটা দেশবাসী জাতির ধর্মীয় চেতনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে করবে এবং তার পরিণতি অবশ্যই সুখকর হবে না।

অবশ্য বর্তমানে হাইস্কুল লেবেলে যে ইসলামিয়াত পড়ানো হয় এবং দশম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়, তার পাঠ্যক্রম একেবারে দায়সারা গোছের, ধর্মীয় শিক্ষকদের গুরুত্বও অনেক ক্ষেত্রে ছয় আঙ্গুলের হাতের বাড়তি আঙ্গুলটির মতো। ক্লাস থাকে একদম শেষে সপ্তম পিরিয়ডে। ছাত্র-ছাত্রীরা থাকে ক্লান্ত অবসন্ন। কোনোমতে বাড়িতে দৌঁড় দেয়ার অপেক্ষা। তবে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এই ১০০ নম্বরের পাঠদানের সুযোগ মোটেও কম নয়। প্রয়োজন শুধু পরিকল্পনার। মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইসলামী আকিদা বিশ্বাস, নামায দোয়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ইসলাম পরিচিতি, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের সামাজিক শিক্ষা ও নীতি নৈতিকতা বিষয়ক কোরআন হাদীসের বিভিন্ন উক্তি প্রভৃতি বিষয় এ স্তরে পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারে। মাদ্রাসার দাখিল স্তরে ফিকাহ শাস্ত্রের জন্য প্রণীত পুস্তকাদি হতে এ স্তরের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

ধর্মীয় তাগাদা ছাড়াও দুনিয়াবী প্রয়োজনেও এ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন- বিদেশী কোনো কোম্পানী যদি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো দেশে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে চায় তাহলে সর্বাগ্রে একটি সার্ভে চালায়। তাতে দেখে যে, এ দেশের মানুষের চিন্তা, আচরণ, রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ কিরূপ। যাতে জনগণের মন আকৃষ্ট করে বাজার দখল করতে পারে অথবা কোনো বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে না হয়। এই সার্ভেতে দেশের মানুষের ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। তার মানে, আমি বলতে চাই যে, নিছক বস্তুগত ও বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে হলেও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস, ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাল ও মন্দের ধারণা, মূল্যবোধ, স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান ও অর্জন যে কোনো শিক্ষার অনিবার্য অনুষঙ্গ। এগুলোকে বাদ দিলে সে শিক্ষা গণমুখি হতে পারে না। কাজেই আমাদের জাতীয় শিক্ষার সর্বস্তরে এ দেশের গণমানুষের লালিত বিশ্বাস ও আচরণকে জানবার ও অনুশীলন করবার জন্যে অবশ্যই শিক্ষাকে ধর্মভিত্তিক করতে হবে। বৃটিশ আমলেও যদি ইন্টারমিডিয়েট স্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আরবী ফার্সী পাঠের ব্যবস্থা থাকতে পারে, এখন কেন থাকবে না? আমাদের জোর দাবি হচ্ছে, ইন্টারমিডিয়েট স্তরে বা প্রস্তাবিত চার বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য তথা প্রতিটি সাবজেক্টে কমপক্ষে ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও অনুশাসনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আর একটি সুন্দর সমাজ ও জীবন গঠনের জন্য কুরআন হাদীসের শিক্ষাগুলো সুলিখিত আকারে পাঠদান করতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা তাদের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত পাঠ গ্রহণ করবে ও পরীক্ষা দেবে।

দেশে প্রচলিত শিক্ষার পরবর্তী স্তর বিএ, এম.এ-বা ডিগ্রি ও মাষ্টার্স। ডিগ্রি দুই ভাগে বিভক্ত। পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স। বিএ অনার্সের প্রতিই যেহেতু ছাত্রদের আকর্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে এর মূল্যায়ন সবচে বেশী সেহেতু এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা চালুর পদ্ধতি নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

সাধারণভাবে বিএ পাস কোর্স বা বিএ অনার্সের ইংরেজী ও বাংলায় ১০০ করে দুইশ নম্বরের বাধ্যতামূলক পরীক্ষা দিতে হয়, যাকে ফাউন্ডেশন কোর্স বলা হয়। আমাদের প্রস্তাব হলো, এ দু'টি মৌলিক বিষয়ের সাথে ১০০ নম্বরের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান সন্নিবেশিত থাকবে।

এরপর যাবতীয় লেখাপড়া হয় অনার্স পদ্ধতিতে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষায়িত শিক্ষা। এসব শিক্ষাকে ইসলামী পদ্ধতিতে সাজানোর তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ জ্ঞান, জ্ঞানই। ইসলাম যে কোন ধরণের জ্ঞানচর্চায় বাধা দেয় না; বরং রসূলে পাকের বাণী হচ্ছে "হিকমত বা বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে মু'মিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই তা পায় সে তার অধিক হকদার।" এই হাদীস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই মুসলমানরা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানভান্ডার মন্থন করেছেন। হাদীস হিসেবে প্রচলিত আরেকটি উক্তিও এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য। অর্থাৎ 'তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর, তা যদি চীন দেশেও হয়।' চীন কখনও ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্র ছিল না। কাজেই সেখানে গিয়ে যে জ্ঞান অন্বেষণের কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ধর্মীয় জ্ঞান নয়। বদরের যুদ্ধে মক্কার

www.pathagar.com

অনেক কুরাইশ নেতা মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। যুদ্ধবন্দির মুক্তির জন্য রাসূলে খোদা (সলঃ) যেসব শর্ত দিয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যে বন্দি ১০ জন মুসলমানকে বিদ্যাশিক্ষা দেবে, তাকে মুক্তি দেয়া হবে। এই বিদ্যা ইসলাম বা ধর্মশিক্ষার বিদ্যা নয়; বরং প্রচলিত লেখাপড়ার জ্ঞান- যা মক্কার মুশরিকরা জানত। কুরআন মজিদের বেশীরভাগ অংশে বনি ইসরাঈলদের চিন্তা, বিশ্বাস. জীবনধারা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই আমরা যদি ১০০ নম্বরের ইসলামিক স্টাডিজের ফাউন্ডেশন কোর্সের চশমা চোখে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করি, তা ধর্মীয় শিক্ষার আওতাভুক্ত বলেই গণ্য হবে। তবে সকল সাবজেক্টে সহায়ক হিসেবে একটি বিশেষ নিয়েমে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ধরুন, অনার্স এর চার বছরের ৮টি সেমিস্টারে ছাত্রছাত্রীদের ৪০টি কোর্সে পরীক্ষা দিতে হবে। তা যে কোনো সাবজেক্টেই হোক। কোর্সের সংখ্যা কম বেশীও হতে পারে। এর সাথে ৫/৬টি ইসলামী কোর্স অতিরিক্ত হিসাবে পড়ানো হবে। যেমন ধরুন, ডাক্তারীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের শিক্ষা, ইসলামী অনুশাসনে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা, রোগীর সেবার মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্য নিহিত থাকা, রাসূলুল্লাহর (সলঃ) চিকিৎসা-পদ্ধতি, মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জীবন ও অবদান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর কয়েকটি কোর্স থাকলে ডাক্তাররা গলাকাটা না হয়ে রোগীর সেবার মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্য সন্ধানী হবেন। তখন আমাদের রোগীরা বিদেশে যাবে না। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। অন্যান্য সাবজেক্টের বেলায়ও এ নিয়মটি প্রযোজ্য হতে পারে।

এতে সবচে বড় যে লাভটি হবে তাহলো ধর্ম সম্পর্কে গোটা জাতি সচেতন হবে। ধর্মের নামে কোনো কুসংস্কার প্রশ্রয় পাবে না। জেএমবির মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা উদ্ভট কোনো উগ্রবাদ জাতিকে আক্রান্ত করতে পারবে না বরং ধর্মের সুন্দর দিকগুলোর চর্চা হবে। গোটা জাতীয় জীবন সুন্দর, গতিশীল ও সমৃদ্ধ হবে।

এই সুযোগে একটি ব্যতিক্রমী প্রস্তাব রাখতে চাই, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি নির্ধারক বা সচেতন মহলের কাছে। ইরাক ইরানসহ অনেক দেশে ইন্টারমিডিয়েটের পর দুই বছর বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে এই ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট থাকতে হয়। সরকারী কর্মচারী হবার জন্যও এই শর্ত। এমনকি পাসপোর্ট পেতে হলেও দুই বছর সামরিক ট্রেনিং এর সার্টিফিকেট শো করতে হয়। আমাদের দেশের বেলায় এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না? বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মাঝে গরীব দেশ হয়েও আমাদের ওপর বলতে গেলে তেমন আঘাত লাগেনি। দুর্নীতি না হলে

www.pathagar.com

হয়ত মোটেও আঁছড় লাগত না। এর মূলে রয়েছে আমাদের জনশক্তি। প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকরাই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার যোগানদাতা ও গ্যারান্টার। কাজেই জাতীয় অর্থনীতি ও দেশকে সকল হুমকির উর্ধে রাখতে হলে দেশের তরুণ সমাজকে সত্যিকার জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। তার জন্যে চাই কারিগরী শিক্ষার গণজোয়ার। স্কুলে মাদ্রাসায় স্বাভাবিক লেখাপড়ার পাশাপাশি, কম্পিউটার শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষার যে কথা বলা হয় বাস্তব অভিজ্ঞতায় তার রেজাল্ট সুখকর নয়। কম্পিউটারগুলো বিকল হয়ে পড়ে থাকা -এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। কাজেই চারদিকে কর্মমুখি জাতিগঠনের বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে প্রস্তাব করতে চাই যে, ইন্টারমিডিয়েটের পর দু'বছর একটি সমন্বিত কোর্সের মাধ্যমে সার্বজনীন কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একে পূর্ব শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হোক। প্রত্যেকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলার প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে যেসব কারিগরী শিক্ষার চাহিদা আছে বা বিদেশের শ্রম বাজারে কদর আছে -এমন সব বিষয়কে এ স্তরের পাঠসূচী রূপে প্রণয়ন করা হোক। তার সাথে নৈতিক শিক্ষাও রাখা হোক- যা অন্য সমাজে আমাদের ছেলেদের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান বয়ে আনবে। তখন গোটা জাতি আত্মনির্ভরশীল, কর্মমুখি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আস্থাবান হতে পারবে বলে একান্ত বিশ্বাস। অতি সহজ ও সরল ভাষায় সংক্ষেপে মনের কথাগুলো লিখলাম। আশাকরি বিবেকবান সচেতন মহলের পরামর্শে তা আরো পরিপুষ্ট হবে।[৪]

[৪] রচনা : ১০ আগষ্ট ২০০৯। প্রকাশ : উপ-সম্পাদকীয়, দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ আগস্ট ২০০৯। অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যা, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া,বায়তুশ শরফ,চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট: মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। এটি সবার কাছে সমানভাবে স্বীকৃত একটি উক্তি। কোন দেশ বা জাতিকে যদি কোন প্রাণী বা মানুষের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে ঐ দেশ বা জাতির নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা হবে তার মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন কোন প্রাণী বা মানুষ যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম তেমনি জাতীয় ইতিহাস,ঐতিহ্য, ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন জাতিও বিশ্বের দরবারে শির উন্নত করে দাঁড়াতে বা নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নত বৈশিষ্ট্যের কারণেই কোন জাতি অন্যান্য জাতিকে দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিতে পারে। আরও একটু গভীর গিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, স্বয়ং শিক্ষা ব্যবস্থারও একটি মেরুদণ্ড আছে। তা হলো শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল আদর্শ ও লক্ষ্য। আদর্শহীন শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ববাসীকে পথ দেখানো দূরে থাক; আপন জাতিকেই পরনির্ভরশীল করে রাখে।

ওপরের সহজ কথাগুলো সামনে রাখলে স্বীকার করতে হবে যে, দেশ ও জাতি হিসেবে আমরা মেরুদণ্ডহীন। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মবোধ ও আদর্শের অবর্তমানে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও মেরুদণ্ডহীন। আজ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজাতীয় আদর্শের অন্ধ-অনুকরণ ও পরনির্ভরশীলতা এই মেরুদণ্ডহীনতারই ফসল।

জাতীয় জীবনে এই শূন্যতা ও দুর্যোগের কথা আমরা সবাই স্বীকার করি। যে কারণে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত ও সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এসব কমিশন ও সুপারিশমালা সমস্যার তেমন কোন সুরাহা করতে পারে নি। ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও বারুদের বহ্নি-উৎসবের কাছে জাতির ভবিষ্যত জিম্মী হয়ে আছে। এই হতাশার মাঝে গোটা জাতির মনে নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকারের কিছু পদক্ষেপ ও বক্তব্য। সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বক্তৃতা-বিবৃতিতে একমুখি শিক্ষানীতি চালু করার লক্ষ্যে ৩৫ বছর পূর্বের গণধিকৃত ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হবার পরপর ১৯৭২-১৯৭৪ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট : মে ১৯৭৪' নামে সদ্য স্বাধীন দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি রূপরেখা পেশ করা হয়। এ রিপোর্ট তার নিজস্ব দুর্বলতা ও ১৯৭৫ সালে সরকার ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের কারণে বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩৫ বছর পেছন থেকে এনে এ রিপোর্টটি বাস্তবায়নের ঘোষণা শুনিয়ে জাতির মনে নানা সন্দেহ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বের ওপর হুমকি আসছে বলে আমরা শংকিত হয়ে পড়েছি। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের পুরো রিপোর্ট পর্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এ রিপোর্টের সুপারিশসমূহ সামনে এনে মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যত কি হতে পারে তা যাঁচাই করব।

রিপোর্টের ২৯৪ পৃষ্ঠা মূল ও ১৩১ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট মিলে ৪২৫ পৃষ্ঠার বইতে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সাকুল্যে সোয়া এক পৃষ্ঠা। তাতেও অধ্যায়-১১ মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা শিরোনামে হিন্দু ও বৌদ্ধদের টোল শিক্ষার একই শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করে আসমানী ইলমের বাহন মাদ্রাসা শিক্ষার চরম অবমাননা করা হয়েছে। (দ্র.বাশিক রি, পৃ-৫৭)

এরপর ইসলাম শিক্ষার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা একদেশদর্শী হওয়ার অপরাধ আবিষ্কার করে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে ঃ

"১১.২. ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস,ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজী ও বাংলা মাদ্রাসার শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে ইসলামী শিক্ষার ওপরই বেশি জোর দেয়া হয়, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। এ কারণে মাদ্রাসা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (বাশিক রি, পৃ-৫৭) এ মন্তব্য থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে ড ঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের মণোভঙ্গি বোঝা যায়। এরপর কমিশন সুপারিশ করেছে ঃ

"১১.৩. বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার অমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে, দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রাথমিক কার্যক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সর্বস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি যে কোনো একটি হতে পারে। তবে যারা ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা পড়বে না তারা সপ্তম শ্রেণী

www.pathagar.com

থেকে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে ইংরেজি পড়বে। তদুপরি ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষাও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।" (বাশিক রি. পৃ-৫৭)

এই সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত অভিন্ন একমুখি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে। এখন সপ্তম অধ্যায়ের দিকে নজর দেয় যাক। রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ৮ বছর মেয়াদের প্রথম পাঁচ বছর বা প্রথম শ্রেণী থেমে ৫ম শ্রেণীর জন্য যে পিরিয়ড ভাগ করা হয়েছে, তাতে কণ্ঠ সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের জন্য সাপ্তাহে ২ ঘন্টা বরাদ্ধ রাখা হয়েছে, অথচ ধর্ম শিক্ষার জন্য একটি ঘন্টাও রাখা হয়নি। তার মানে, মাদ্রাসা ছাত্রদের অন্যান্য বিষয়ের সাথে সপ্তাহে দুই ঘন্টা গান ও বাদ্যযন্ত্রের তালিম দেয়া হলেও ধর্ম শিক্ষা বা আরবী পড়তে দেয়া হবে না।

খানিকটা উদারতা দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দ্বিতীয় ভাষা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে; অর্থাৎ ইংরেজি, আরবী, সংস্কৃত ও পালির মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্ররা আরবী ভাষা নিতে পারবে। কিন্তু সেরূপ করলে অবশ্যই সপ্তম শ্রেণীতে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ইংরেজি পড়তে হবে। ওদিকে নবম, দশম, একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে আরবীর অস্তিত্ব নেই। কাজেই পূর্বাপর সম্পর্কহীন ৩টি বছর তারা খানিকটা আরবী পড়বে কোন দু:খে? অনুরূপভাবে সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা বা নীতি বিষয়ক শিক্ষার জন্য সপ্তাহে মাত্র দু'টি পিরিয়ড(ঘন্টা) রাখা হয়েছে।পরে নবম, দশম, একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক ও সাধারণ কোর্সে ধর্মশিক্ষাকে কোন মতে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে স্থান দেয়া হয়েছে। মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েটে যদি ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক না হয় এবং পরীক্ষা দিতে না হয়, তাহলে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষার বোঝা কেন ছাত্ররা বহন করবে, তা তারাই বলতে পারেন। এদিকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত তো ধর্ম শিক্ষার অস্তিত্বই রাখা হয়নি।

যাই হোক কমিশন দয়া করে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ধর্ম শিক্ষার অস্তিত্ব রাখা হয়েছে বলে বদান্যতা দেখিয়েছে। তাতেও এ স্তরটি দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি বৃত্তিমূলক কোর্স ও অপরটি সাধারণ কোর্স। বৃত্তিমূলক কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয়রূপে ৪১টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যার সর্বশেষ বা ৪১ তমটি 'কেশ বিন্যাস'। আর মাঝখানে ২৯ নম্বরটি 'ধর্ম শিক্ষা'। (দ্র. বাশিক রি. পৃ-৩১ ও ৩২)

তার মানে, মাদ্রাসার ছাত্ররা এ স্তরে এসে ২৯ নম্বরের ধর্ম শিক্ষাটি গ্রহণ করে ধন্য হতে পারবে। এ স্তরে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয়

www.pathagar.com

হিসেবেও ধর্ম শিক্ষার অস্তিত্ব রাখা হয়নি। আসলে এর মাধ্যমে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা নয়, কলেজেও ইসলাম ও ধর্মীয় শিক্ষার বারোটা বাজানোর যে কুদরতি কারিশমা ড. কুদরাত-এ-খুদা দেখিয়েছেন, তা ভাবতেই অবাক লাগে।

সামগ্রিক মূল্যায়নে দেখা যায়, ড. কুদরাত-এ-খুদা মাদ্রাসায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত গান ও বাদ্যযন্ত্রের জন্য সপ্তাহে ২ ঘন্টা বরাদ্দ রাখলেও ধর্ম শিক্ষার জন্য ১টি ঘন্টাও দেননি। তারা নাকি ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলকভাবে সপ্তাহে ২ ঘন্টা ধর্ম শিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষা পড়তে পারবে। এছাড়া দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবী পড়তে পারবে। এরপর তাদের জন্য অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ কিংবা আলোর জগত থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার একটা সুযোগ আসবে। তাহলো :

"১১.৪ আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদ্রাসা ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক ধর্ম শিক্ষা কোর্স পড়তে পারবে।" (বাশিক রি. অধ্যায়-১১ পৃ-৫৭)

তবে শর্ত আরোপ করা হয়েছে ঃ

"এ কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত আবশ্যিক চারটি বিষয় (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী) অবশ্যই পড়তে হবে।" (বাশিক রি, অধ্যয় ১১.৪ পৃ-৫৭)

ব্যাখা নিস্প্রয়োজন।

এবার প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক ধর্ম শিক্ষা কোর্সের সন্ধান করা যাক। দেখা যাক সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কি অমৃত সুধা রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত ৮ম অধ্যায়ের ৮.৮ ধারায় ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্রেণীর বৃত্তিমূলক কোর্সে ৪১টি বিষয়ের মধ্যে ২৯তমটি ধর্ম শিক্ষা। এটিই মাদ্রাসা ছাত্রদের ৩ বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক ধর্ম শিক্ষার চূড়ান্ত সুযোগ।

এর পরবর্তী স্তর সম্পর্কে শুধু মন্তব্য করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, "এ শিক্ষার পরবর্তী স্তর বিন্যাস হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দু' বছরের পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স।" (বাশিক রি, ১১.৪ পৃ-৫৭)

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখার যে কথা বলা হয়েছে তার শিরোনামটি লক্ষ্য করুন ঃ "কৃষি বিভাগ, গার্হস্থ অর্থনীতি বিভাগ, ললিতকলা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও ধর্ম শিক্ষা বিভাগ।" (বাশিক রি.পৃ-৩৬)

তাতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রতিটি বিভাগের জন্য যেসব বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কৃষি বিভাগ : ৬ টি; গার্হস্থ অর্থনীতি বিভাগ, ১০ টি; ললিতকলা বিভাগ ঃ ১১ টি; শিক্ষা বিভাগ ঃ ১৩ টি। আর ধর্ম শিক্ষার বেলায় শুধু

www.pathagar.com

বলা হয়েছে : "ধর্ম বিভাগ : ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবে।" (বাশিক রি,পৃ- ৩৬)

অর্থাৎ অন্যান্য বিভাগের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় নির্দেশ করলেও ধর্ম শিক্ষা বিভাগে এসে তাদের হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। আসল কথা হলো, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা থেকে ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণ উৎখাত করার জঘন্য মানসিকতা ও কূটকৌশল নিয়েই ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রণীত। তার প্রমাণ এর ভূমিকা। রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

"প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে কমিশনের সদস্যগণকে বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুণর্গঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহবান জানান। (বাশিক রি. ভূমিকা :প্রথম পৃষ্ঠা)।

অধ্যায় ১ : শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী শিরোনামে ১.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : ....নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।" (বাশিক রি.পৃ-ক)

সমাজতন্ত্র?! নব্বই-এর দশকের শেষ প্রান্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন খানখান হয়ে সামাজতন্ত্রের দাফন-কাফন সম্পন্ন হবার পর তার কঙ্কাল এখন ইতিহাসের জাদুঘরে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এদেশের জনগণের কাছে কখনো সমাজতন্ত্র ও নাস্তিকতা বাঞ্ছিত বস্তু ছিল না। কাজেই সামাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে রিপোর্ট প্রণীত তার মরা লাশ এনে জাতির ঘাড়ে চাপানোর যে কোন প্রয়াস এদেশের মানুষ প্রতিহত করবেই। শাসকবর্গ বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

ভূমিকার আরো একটি তথ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলো –

"ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে শিক্ষা কমিশনের সভাপতির নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত ভ্রমণ করেন। প্রায় এক মাসব্যাপী এই সফরে তাঁরা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সফরের সুব্যবস্থা ও সহৃদয় আতিথেয়তার জন্য ভারত সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহ এবং সেখানকার শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।" (বাশিক রি,ভূমিকা : প্রথম পৃষ্ঠা)

কমিশন আরো দেশ সফর করে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী শুধু ভারত সফর

www.pathagar.com

করে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞাতা এনে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন, তা ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে, বাংলাদেশের মতো কোন স্বাধীন দেশের নয়।

আমার ধারণা, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা, যাঁরা একমুখি শিক্ষা প্রবর্তন ও ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের কথা জোর গলায় বলছেন, তাঁরা রিপোর্টটি ভালভাবে পড়েন নি অথবা এর ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন নি। নচেৎ জনগণের ধর্মীয় চেতনা, বিশেষতঃ ইসলামী শিক্ষার জন্য আত্মঘাতি একটি সুপারিশমালার পক্ষে তাঁরা কথা বলতে পারতেন না। অথচ শোনা যায় যে, মরহুম শেখ মজিবুর রহমানও এ কারণে রিপোর্টটি কার্যকর হতে দেন নি। ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিলুপ্তির নীল নকশা ছাড়াও রিপোর্টটি সময়ের বিচারেও অনেক সেকেলে অর্থাৎ আজ থেকে ৩৫ বছর আগের। এর মধ্যে দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রস্তাবনা হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল এমন অনেক বিষয় ইতোমধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু হয়েছে। যেমন শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট, প্রাক-প্রাইমারী শিক্ষা প্রভৃতি। আবার এমন অনেক বিষয় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু রয়েছে, যার চিন্তা-ভাবনা ঐ কমিশনের মাথায়ও আসে নি। যেমন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কম্পিউটার বিজ্ঞান, অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কলেজ ও স্বায়ত্বশাসিত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। ড. কুদরাত-এ-খুদা যখন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরী করেন তখন বাংলাদেশের মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১,৪১২ টি। তন্মধ্যে কামিল ৪৫, ফাযিল ৩০০, আলিম ৩০২ ও দাখিল ৭৬৫ টি।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৯,১৫০ টি এবং আলিম ২,৪৪৬ টি। ফযিল ও কামিল বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত। এবং এ দু'য়ের সংখ্যা ১,২৯৬ ও ১৮৯। গত ৩৫ বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। নতুন নতুন মাদ্রাসা ছড়াও সিলেবাসে সে নতুনত্ব আনা হয়েছে, তার ফলে মাদ্রাসা ছাত্ররা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার ছাত্রদের সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আরব বিশ্বের সমমানে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রমেও যুগান্তকরী পরিবর্তন এসেছে। ইলমে কিরাতেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমার বিশ্বাস, মাদ্রাসা শিক্ষার এসব বৈশিষ্ট্যের কথা ভালভাবে তুলে ধরা হলে সাধারণ শিক্ষার কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা মাদ্রাসা শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেবে। কেননা, মাদ্রাসায় কুরআন হাদীস ও আরবীর সাথে

www.pathagar.com

সাধারণ শিক্ষায়ও শিক্ষিত হওয়ার সমান সুযোগ রয়েছে। আর দাখিল ও আলিমের পর সরাসরি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগও আছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নত সিলেবাসের বৈশিষ্ট্যগুলো জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য মাদ্রাসা বোর্ডসহ সকল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও আলেম সমাজের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। আমরা স্বীকার করছি যে, মাদ্রাসা শিক্ষার সামনে এখনো হাজারো সমস্যা বিদ্যমান। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে; বিশেষ করে ফাযিল-কামিলের মানগত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যে ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি গণদাবিতে পরিণত হয়েছিল। এই দাবিতে গণজোয়ারের চূড়ান্ত পর্যায়ে সিলেটের ফুলতলীর মরহুম পীর সাহেব হুজুর বৃদ্ধ বয়সে পাঁচশত গাড়ির বিরাট কাফেলা নিয়ে লংমার্চ করে ঢাকায় আসেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পীর সাহেব হুজুরের সাথে বৈঠক করে ওয়াদা দেন যে, সংসদের শেষ অধিবেশনে ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিল অনুমোদন করা হবে। কিন্তু তিনি সে কথা রাখেন নি। অদৃশ্য মহলের চাপের কাছে তিনি পীর সাহেব হুজুরকে দেয়া ওয়াদা থেকে উল্টে যান।

শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল শ্রেণীর ভাগ্য কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ন্যস্ত করে সংসদে বিল পাশ করা হয়। অথচ মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, আলেম, পীর-মাশায়েখ ও সাধারণ ইসলামী জনতার আপত্তি ছিল কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, নামে ইসলামী হলেও বর্তমানে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে তার অবস্থা ভিন্নতর নয়। তার অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য ও আখলাকী বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। তাছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, প্রশাসনিক নানা সমস্যা ইত্যাদির ধকল সয়ে মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। কিন্তু নিরূপায় হয়ে সেই বিলের প্রস্তাবনা মেনে নেয়া হয় এবং মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিলের ছাত্ররা বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, যেহেতু মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল স্তরের মঞ্জুরী বা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতায় তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না, সেহেতু ফাযিল-কামিলের মান সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে পঙ্গু বানিয়ে রাখা হয়েছে। যার ভবিষ্যত খুবই অন্ধকার। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই এখন হুমকির মুখে। আমি বলতে চাচ্ছি, মাদ্রাসা শিক্ষার ফাযিল ও কামিল স্তর হচ্ছে বিশেষজ্ঞ তৈরির শিক্ষা। দেশবাসীর চাহিদা মোতাবেক হাদীসবেত্তা, তাফসীরবিদ,

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসবিধ, ফিকাহবিদ (ইসলামী আইনজ্ঞ) ও আরবী সাহিত্যিক তথা ইসলামী ও আরবী বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্যই ফাযিল ও কামিল স্তরের লেখাপড়া। যার জন্য প্রচলিত নিয়মে অনার্স কোর্স ছাড়া উপায় নেই। অথচ বর্তমানে ফাযিল ও কামিল স্তরে শুধু পাস কোর্স চালু হয়েছে। যার লক্ষ্য বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।

সাধরণ ছাত্ররাও জানে যে, বর্তমানে পাস কোর্সের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। অনার্স কোর্স ছাড়া ভাল চাকরিরও সুযোগ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএ পাস এর কোনো সুযোগ নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য এ সুযোগ অবারিত রেখেছে। যারা চাকরি করতে গিয়ে নেহায়েত্ব একটি ডিগ্রির জন্য প্রমোশন বঞ্চিত, তারা পাশ কোর্স পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী নিচ্ছেন। তাই অনেক সময় রসিকতা করে বলা হয়, বি এ পাস মানে বিয়ে পাস। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল টার্গেট থাকে কোথাও অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়া। এমতাবস্থায় মাদ্রাসার হুজুরগণ ফাযিল পাস কোর্সের জন্য নানা কৌশলে ছাত্র-ছাত্রীদের কতদিন ধরে রাখতে পারবেন, এখনই সে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একাডেমিক কর্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে অনার্স কোর্সের ভিত্তিতে। অথচ তার সাথে জুড়ে দেয়া ফাযিল-কামিলে চালু করা হয়েছে পাস কোর্স। বিষয়টি আমাদের বুঝতে খুব কষ্ট হচেছ।

এক সময় ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলমী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর লিখেছি। কিন্তু দেখলাম যে, যারা এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন ও সিদ্ধান্ত নেবেন, তাদের মাথায় দলীয় রাজনীতির বাইরে কিছু ঢুকে না; কিংবা বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার উর্ধে গিয়ে চিন্তা করবার সময় অনেকের নেই। ফলে আপাতত চুপসে গেছি। এখনও এই কথাগুলো মনের গভীর দু:খবোধ থেকে লিখছি। আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ঢাকায় একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার ভাগ্য পরিবর্তনের বিকল্প কোনো পথ নেই। তার আগে অন্তত ফাযিল ও কামিলে অনার্স কোস চালু করতে হবে। নচেত সোজা কথায় মাদ্রাসা শিক্ষার কল্লা কাটা যাবে। কারণ, অতীতে ১৯৫৭ সালে যেমন নিউ স্কীমের পাল্লায় পড়ে আলিয়া নেসাবের প্রায় সকল মাদ্রাসা স্কুল কলেজে বদলে গেছে, এবারও এই মাদ্রাসাগুলো স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

তবে এরপরও একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আল্লাহ না করুন, আমাদের অমার্জনীয় অবহেলার কারণে বর্তমান মাদ্রাসাগুলো স্কুল কলেজ হয়ে গেলেও মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল এবং থাকবে। আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সা:)-

www.pathagar.com

এর হাদীস যতদিন থাকবে ততদিন তার চর্চার বাহন মাদ্রাসা শিক্ষাও থাকবে। এ শিক্ষাকে উৎখাত করার ক্ষমতা কোন সরকার বা শক্তিধরের নেই।

মদীনা মুনাওয়ারায় আসহাবে সুফফার দরসগাহ থেকে শুরু হয়ে এই মাদ্রাসা শিক্ষা উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে গোটা দুনিয়াকে আলোকিত করেছিল। ভারতবর্ষে মুসলমানদের ৮০০ বছরের রাজত্বকালে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। এ সময় ভারতবর্ষ ছিল খ্যাতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে। যার লোভে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইংরেজরা এদেশে এসেছিল এবং পরে ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসেছিল। ইংরেজ বেনিয়ারা সেই শিক্ষাকে উৎখাত করে তাদের সেবাদাসগিরির ইংরেজী শিক্ষা চালু করে। এরপরও উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও নৈতিক চরিত্র চর্চার বাহন হিসেবে চরম অবহেলার মধ্যেও মাদ্রাসা শিক্ষা জাতিকে আলো দেখিয়েছে, ইসলামকে জীবিত রেখেছে।

বর্তমান সমাজে যেটুকুন নীতি-নৈতিকতা, প্রেম-ভালবাসা বিদ্যমান তা একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান। নচেৎ গলাকাটা ডাক্তার, দুর্নীতিবাজ আমলা ও সন্ত্রাসী নেতাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের আস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেত। এত ঘন জনবসতির এলাকায় যেটুকুন শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান তার জন্য অগণিত মসজিদ ও ইসলামী জলসার ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; যার চালিকাশক্তি মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষা দেড় হাজার বছরের ইসলামী জাহানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঞ্চয়ের ধারক। বর্তমানে মুসলিম জাহানে সর্বাধিক প্রচলিত তিনটি ভাষা আরবী, ফার্সী ও উর্দু। এ ভাষাগুলোর চর্চা মানে সুদীর্ঘ অতীত ও সুবিশাল বর্তমানের সাথে একাত্ম হওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া। বলাবাহুল্য, এই তিনটি ভাষার পরিচর্যা হয় মাদ্রাসায়। সরকার সর্বজনীন গণশিক্ষার কথা বলছেন। মসজিদ সংলগ্ন ফোরকানিয়া ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো যে অতি অল্প খরচে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত করে দেশ ও জাতিকে এ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তা কি একবার চিন্তা করে দেখবেন? মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে অস্বীকার করবেন? ঈদের জামাতে, জুমায়, ইজতেমায়, ধর্মীয় সমাবেশে যে কোটি কোটি লোক সমবেত হয় তারা মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার দাবিদার। জনগণের অনুভূতিকে মূল্য না দিয়ে কেউ শেষ রক্ষা পাবেন না। সব কিছুকে রাজনীতি মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে।

আমরা রাজনীতির ভাষায় কথা বলতে চাই না। তবে সরকারের মধ্যে ঘাপটি মারা কুচক্রী মহলটি সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই। এই চক্রটিই ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চুপিসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, স্কুলে ১০ম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা ইসলামিয়াতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বরে হবে। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখার চেষ্টা চালায়। যদিও

www.pathagar.com

জনগণের প্রচন্ড প্রতিবাদের মুখে আপাতত লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। এই মহলটিই মাদ্রাসার দ্বীনি পরিবেশ ধংসের কুমতলবে মাদ্রাসায় শতকরা ৩০% ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের খড়্গ ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমাদের ধরণা, সেই কুচক্রী মহলটিই ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের নতুন চক্রান্ত শুরু করেছে।

পরিশেষে দেশের কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই, বালাকোটের যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ে পরাজিত হবার পর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা কওমী মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় জাতিকে হেদায়তের দায়িত্ব পালন করতে হলে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যা যা দরকার তা কওমী মাদ্রাসাগুলোতে নেই। এই অভাব পূরণ করার পরিবর্তে কওমী মাদারাসা মহল থেকে তাদের সনদের সরকারী স্বীকৃতির দাবি উঠেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নেয়া, না নেয়ার লাভ-ক্ষতির বিরাট ফাঁপড়ে পড়ে গেছেন তারা। জানি না, আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষার বিবর্তন ও বর্তমান অবস্থার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে তারা কোন শিক্ষা নিতে পারবেন কি না। পশ্চিমাদের কাছে বড় আতঙ্ক, মাদ্রাসা শিক্ষা। যেভাবেই হোক আলেমদের বশ করতেই হবে - এ লক্ষ্য নিয়ে জোরদার তৎপরতা দৃশ্যমান। এ মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা ও শত্রুর চক্রান্ত সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা দেখাতে না পারলে পরিণতি হবে বালাকোটের আরেকটি ময়দানে পরাজয় বরণের সমান।[৫]

[৫] রচনা : ১০/০৬/২০০৯ ; প্রকাশ : আদিগন্ত পাতা, দৈনিক ইনকিলাব ০৩/০৭/২০০৯। আগষ্ট ২০০৯ সংখ্যা, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম। ০৬/০৮/২০০৯ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার জাতীয় কাউন্সিল '০৯ উপলক্ষে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

লেখকের আরো কয়েকটি বই

- মওলানা রূমীর (র) মসনবী শরীফ (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ১ম খণ্ড)
- ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান (অনুবাদ ও সম্পাদনা)
- কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম (ফার্সী ভাষায়)
- ইরানের বুলবুল হাফেয শিরাজী
- মাদ্রাসা শিক্ষা কোন পথে ?
- ইসলামী আন্দোলনের আগামী দিনের নেতৃত্ব
- ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ
- মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বের দাবী
- খৃষ্টান ধর্মের গোপন রহস্য
- রমযানুল মোবারক
- ভাবের সৈকতে শান্তির সন্ধান
- আইয়ুহাল ওয়ালাদ (হে বৎস) ঃ ইমাম গাযযালী (রহ.) (অনুবাদ)

www.pathagar.com

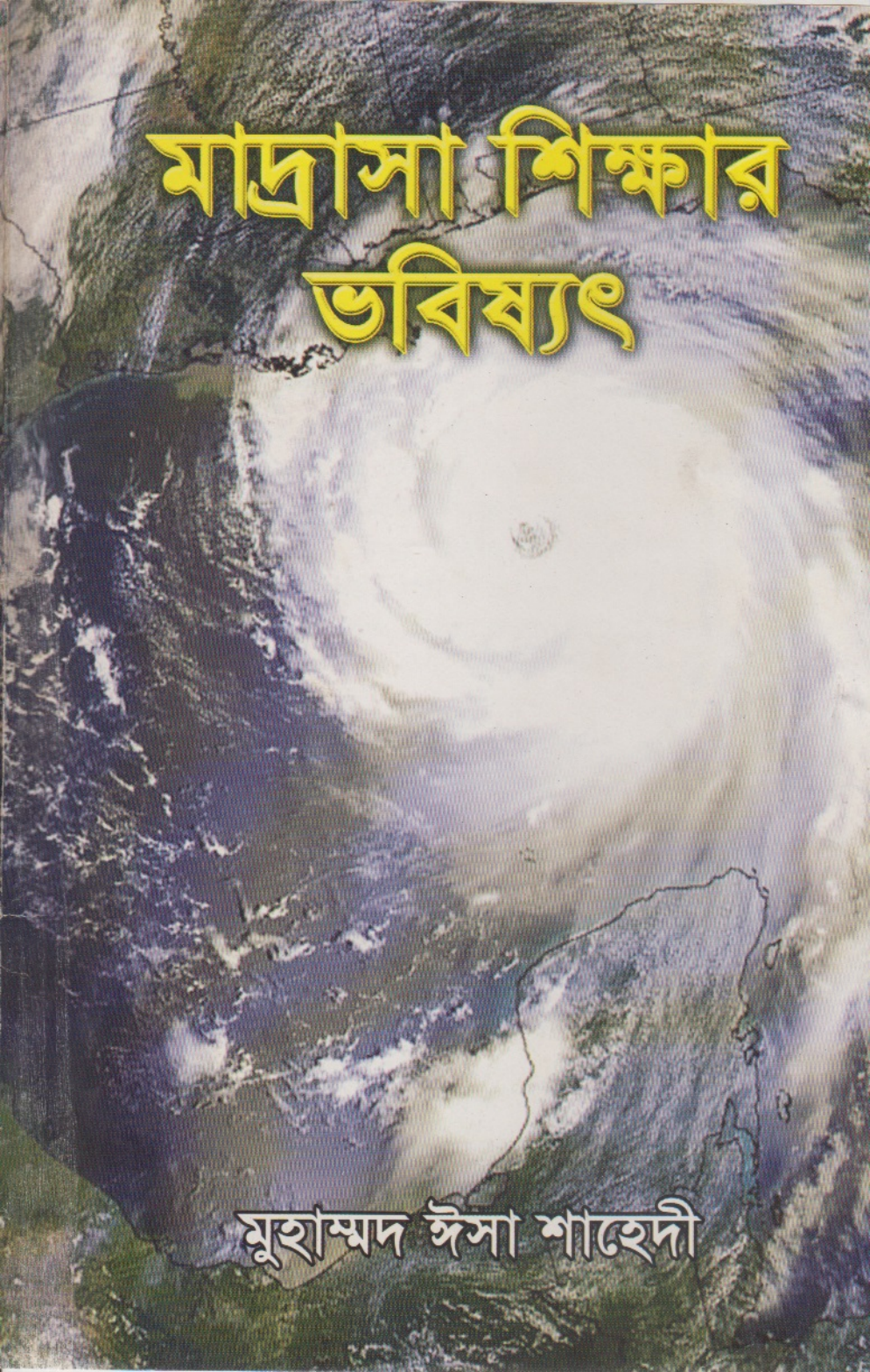

মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী